



कृषि  
वंशान

बहु  
गंगा  
तदी

# বরফ গলা নদী

জহির রায়হান

eBook Created By: Sisir Suvro

**Find More Books!**

**Gooo...**

[www.dlobl.org](http://www.dlobl.org)

[www.dlobl.com](http://www.dlobl.com)

[www.shishukishor.org](http://www.shishukishor.org)

[www.boierhut.com/group](http://www.boierhut.com/group)

## উপসংহারের আগে

উত্তরের জানালাটা ধীরে ধীরে খুলে দিলো লিলি। এক ঝলক দমকা বাতাস ছুটে এসে আলিঙ্গন করলো তাকে। শাড়ির আঁচলটা কাঁধ থেকে খসে পড়লো হাতের উপর। নিকষকালো চুলগুলো ঢেউ খেলে গেলো। কানের দুল জোড়া দোলনার মত দুলে উঠলো। নীল রঙের পর্দাটা দুহাতে টেনে দিলো সে। তারপর, বইয়ের ছোট আলমারিটার পাশে, যেখানে পরিপাটি করে বিছানা, বিছানার ওপর দুহাত মাথার নিচে দিয়ে মাহমুদ নীরবে শুয়ে, সেখানে এসে দাঁড়ালো লিলি। আশ্তে করে বসলো তার পাশে। ওর দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে মাহমুদ বললো, আমি যদি মারা যেতাম, তাহলে তুমি কি করতে লিলি?

আবার সেকথা ভাবছো? ওর কণ্ঠে ধমকের সুর।

মাহমুদ আবার বললো, বল না তুমি কি করতে?

কাঁদতাম। হ্লতো? একটু নড়েচড়ে বসলো লিলি। হাত বাড়িয়ে মাহমুদের চোখ জোড়া বন্ধ করে দিয়ে বললো, তুমি ঘুমোও, প্লিজ ঘুমোও এবার। নইলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে যে। আজ ক'রাত ঘুমোও নি সে খেয়াল আছে?

মাহমুদ মুখের ওপর থেকে হাতখানা সরিয়ে দিলো ওর, কি বললে লিলি, তুমি কাঁদতে, তাই না?

না কাঁদবো কেন, হাসতাম। কপট রাগে মুখ কালো করলো লিলি। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পাকঘরের দিকে চলে গেলো সে। মাহমুদ নাম ধরে বারকয়েক ডাকলো, কিন্তু কোন সাড়া পেলো না। পাকঘর থেকে থালা-বাসন নাড়ার শব্দ শোনা গেলো। বোধ হয় চুলায় আঁচ দিতে গেছে লিলি।

চোখ জোড়া বন্ধ করে ঘুমোতে চেষ্টা করলো সে। ঘুম এলো না। বারবার সেই ভয়াবহ ছবিটা ভেসে উঠতে লাগলো ওর স্মৃতির পর্দায়। যেন সব কিছু দেখতে পাচ্ছে সে। সবার গলার স্বর শুনতে পাচ্ছে। মা ডাকছেন তাকে, মাহমুদ,

‘বাবা বেলা হয়ে গেলো, বাজারটা করে আন তাড়াতাড়ি।’ চমকে উঠে চোখ মেলে তাকালো সে। সমস্ত শরীর শিরশির করে কাঁপছে তার।

বুকটা দুরুদুরু করছে। ভয় পেয়েছে মাহমুদ। তবু আশেপাশে তাকালো সে। মাকে যদি দেখা যায়। কিন্তু তার নজরে এলো না। এলো একটা আরশুলা, বইয়ের আলমারিটার ওপর নিশ্চিন্তে হেঁটে বেড়াচ্ছে সেটা। তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল মাহমুদ।

একটু পরে পাকঘর থেকে এক গ্লাস গরম দুধ হাতে এ ঘরে এলো লিলি। ওকে দেখতে পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হলো মাহমুদ। একটুকাল নীরব থেকে বললো, আমি মরলাম না কেন, বলতে পারো লিলি?

সে কথার জবাব দিলো না। বিছানার পাশে গোল টিপয়টার ওপর গ্লাসটা নামিয়ে রাখলো।

মাহমুদ আবার জিজ্ঞেস করলো, কই আমার কথার জবাব দিলে না তো।

লিলি বললো, দুধটা খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

কী প্রশ্ন?

আমি মরলাম না কেন?

লিলি ফিক্ করে হেসে দিয়ে বললো, ‘আমার জন্যে।’ বলে আবার গম্ভীর হয়ে গেলো সে। দুধের গ্লাসটা ওর মুখের কাছে এগিয়ে ধরে বললো, নাও, দুধটা খেয়ে নাও।

কয়েক ঢোক খেয়ে মাহমুদ সরিয়ে দিলো গ্লাসটা, আমার বমি আসছে।

লেবু দেবো? সামনে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলো লিলি।

মাহমুদ মাথা নাড়লো, না।

লিলি ওর চুলের ভেতর হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, বড় বেশি চিন্তা করো তুমি, ওসব ভেবে কি কোন কুল-কিনারা পাবে? এখন ঘুমাও লক্ষ্মীটি।

ধীরে ধীরে চোখ বুজলো মাহমুদ।

একটু পরে ঘুমিয়ে পড়লো সে। ওর হাতখানা কোলের ওপর থেকে নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে উঠে পড়লো লিলি। কল-গোড়ায় গিয়ে হাতমুখ ধুলো। পা টিপে টিপে ঘরে এসে আলনা থেকে তোয়ালেটা নাবিয়ে নিয়ে মুখ মুছলো। আয়নাটা সামনে রেখে ঘন কালো চুলগুলো আঁচড়ে নিলো। পরনের শাড়িটার দিকে একবার তাকালো সে। না, এতেই চলবে। বাইরে বেরুবার আগখান দিয়ে একবার এসে নিঃশব্দে মাহমুদকে দেখে গেলো লিলি। তারপর টেবিলের উপর থেকে তালাটা তুলে নিয়ে হাক্কা পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিলো দরজায়। টেনে দেখলো ভালোভাবে লেগেছে কিনা। তারপর চাবিটা ব্যাগের মধ্যে রেখে দিয়ে রাস্তায় নেমে এলো লিলি। কাছাকাছি কোন রিক্সা চোখে পড়লো না।

আশেপাশে কোন রিক্সাস্ট্যান্ডও নেই। বেশ কিছুদূর হেঁটে গিয়ে তারপর পাওয়া যেতে পারে একটা।

ব্যাগটা খুলে, পয়সা নিয়েছে কিনা দেখলো লিলি। নিয়েছে সে। কিছু খুচরো আর দুটো এক টাকার নোট।

এই দুপুর রোদে বেশিদূর হাঁটতে হলো না। খানিক পথ আসতে একটা রিক্সা পাওয়া গেলো। হাত বাড়িয়ে তাকে থামালো লিলি, ভাড়া যাবে? আজিমপুর গোরস্থানে যাবো। কত নেবে?

আট আনা, মেমসাব।

কোন দ্বিধা না করে রিক্সায় উঠে বসলো লিলি।

বিকলে বাসায় ফিরে এসে তালাটা খুলতে গিয়ে হাত কাঁপছিলো তার। সাবধানে দরজাটা খুললো। এখনো ঘুমুচ্ছে মাহমুদ। কপালে মৃদু ঘাম জমেছে তার। কাছে এসে শাড়ির আঁচল দিয়ে স্নেহে তার কপালটা মুছে দিলো সে। তারপর অতি ধীরে ধীরে নিজের মুখখানা নামিয়ে এনে ওর মুখের ওপর রাখলো

লিলি। গভীর আবেগের অস্পষ্ট স্বরে বললো, এর বেশি কিছু আমি চাই নে তোমার কাছে। চিরকাল এমনি করে যেন তোমাকে পাই।

মাহমুদ নড়েচড়ে উঠে ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করে বললো, মরলে মানুষ কোথায় যায় লিলি?

লিলি মুখ তুলে সভয়ে তাকালো ওর দিকে। ঘুমের মধ্যেও সেই একই চিন্তা করছে লোকটা। দিনে রাতে এভাবে যদি মৃত্যুর কথা ভাবতে থাকে তাহলে হয়তো একদিন পাগল হয়ে যাবে মাহমুদ। না, তার এই ভয়াবহ পরিণতির কথা কল্পনা করতে পারে না লিলি। এ পরিণাম প্রতিহত করতে হবে। ভালবাসার বাঁধ দিয়ে ধ্বংসের প্লাবন রোধ করবে সে।

বিছানার পাশে বসে অনেকক্ষণ তার গায়ে, মাথায়, মুখে হাত বুলিয়ে দিলো লিলি। যেন হাতের স্পর্শে ওর হৃদয়ের সকল ব্যথা আর সমস্ত যন্ত্রণার উপশম করে দিতে পারবে। তার ভেতরে বেদনার সামান্য চিহ্নটিও থাকতে দেবে না লিলি। থাকবে শুধু আনন্দ। অনাবিল হাসি। তৃপ্তিভরা শান্ত-ম্লিন্ধ সুন্দর জীবন। যেখানে অশ্রু নেই। বিচ্ছেদ নেই। হাহাকার নেই। প্রেম প্রীতি আর ভালবাসার একচ্ছত্র আধিপত্য সেখানে।

লিলি ভাবছিলো।

দুয়ারে মৃদু কড়া নাড়ার শব্দে উঠে দাঁড়ালো সে। সাবধানে দরজাটা খুলতেই দেখলো মনসুর দাঁড়িয়ে।

উনি এখন কেমন আছেন? ভেতরে এসে মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলো মনসুর।

লিলি চাপা কণ্ঠে বললো, ভালো।

ঘুমুচ্ছেন দেখছি। বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালো মনসুর, কখন ঘুমিয়েছেন?

অনেকক্ষণ হলো। মাহমুদের গায়ের কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে লিলি বললো, আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসুন না।

মনসুর বললো, না, এখন বসব না। উনি কেমন আছেন দেখতে এসেছিলাম। কাল সকালে আবার আসবো আমি। রাতে অবস্থা যদি খারাপের দিকে যায় তাহলে আমাকে খবর দিবেন।

আচ্ছা। লিলি ঘাড় নেড়ে সাই দিলো।

যাবার আগে, টাকা-পয়সার কোন প্রয়োজন আছে কিনা জানতে চাইলো মনসুর।

লিলি সংক্ষেপে বললো, না।

প্রয়োজন হলে সঙ্কোচ না করে চাইবেন। লিলির চোখে চোখ রেখে মনসুর কাতর কণ্ঠে বললো, দয়া করে আমাকে পর ভাববেন না।

না না সে কি কথা। দ্রুত মাথা নেড়ে লিলি বললো, ওকে, প্লিজ ভুল বুঝবেন না আপনি।

মনসুর চলে গেলে আবার বিছানার পাশে এসে বসলো লিলি।

ছোট্ট শিশুর মত ঘুমুচ্ছে মাহমুদ। নির্লিপ্ত প্রশান্তির কোলে আত্মসমাহিত সে। ভবিষ্যতের দিনগুলো এমনি কাটুক।

অর্থের প্রাচুর্য সে চায় না। এই ছোট্ট ঘরে, নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের আলিঙ্গনে নির্বাক প্রবাহে কেটে যাক দিন। এই শুধু তার চাওয়া। কিন্তু এ যেন একটা অতি সুন্দর কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। লিলি ভাবে, মাহমুদের সঙ্গে বিয়ে হলে পর, এই যে একটা অনাবিল জীবনের কথা ভাবছে সে, সে জীবন কি বাস্তবে রূপায়িত হবে?

তবু মানুষ তাই চায়।

লিলিও চাইছে।

কে জানে মরিয়মও হয়তো তাই চেয়েছিলো।

আর সেই দুষ্ট মেয়ে হাসিনা। সেও কি এমনি অন্ধকার ঘন সন্ধ্যায় বসে,  
এমনি কোন কল্পনার জাল বুনেছিলো?



## তারও আগে যা ঘটেছিল

সরু গলিটা জুড়ে ধীরে ধীরে এগুতে লাগলো রিক্সাটা। কিছুদূর এলে, মরিয়ম বললো, এবার নামতে হবে লিলি। সামানে আর রিক্সা যাবে না। বলতে বলতে রিক্সা থেকে নেমে পড়লো সে। তার পিছু পিছু লিলিও নামল নিচে।

চারপাশে নোঙরা আবর্জনা ছড়ানো। কলার খোসা, মাছের আমিষ, মরা ইঁদুর, বাচ্চা ছেলেমেয়েদের পায়খানা-সব মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। দুর্গন্ধে এক-মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

আঁচলে নাক ঢেকে লিলি বললো, আর কতদূর?

এই তো আর অল্প একটু-বলে সামনে হাত দিয়ে দেখালো মরিয়ম।

এদিকে গলিটা আরো সরু হয়ে গেছে। একজনের বেশি লোক পাশাপাশি হেঁটে যেতে পারে না। মরিয়ম আগে লিলিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলছে। নাকে ওর শাড়ি দিতে হয় নি, রোজ দুবেলা এ পথে আসা যাওয়া করতে করতে এসব দুর্গন্ধ ওর নাক-সহ্য হয়ে গেছে। আরো খানিকটা পথ হেঁটে এসে একটা আস্তর-ওঠা লাল দালানের সামনে দাঁড়ালো মরিয়ম।

লিলি বললো, এটা বুঝি তোমাদের বাসা?

মরিয়ম মাথা নেড়ে সাই দিলো, হ্যাঁ।

দোরগোড়ায় একটা নেড়ি কুকুর বসে বসে গা চুলকাচ্ছিলো।

ওদের দেখে এক পাশে সরে গেলো সে। এতক্ষণে নাকের উপর চেপে রাখা আঁচলটা নামিয়ে নিলো লিলি।

দরজাটা পেরুলে একটা সরু বারান্দা। দুপাশে দুটো কামরা। একটিতে মাহমুদ থাকে। আরেকটিতে মরিয়ম আর হাসিনা। বারান্দার শেষ প্রান্তে আরো একটি কামরা আছে। ওটাতে মা আর বাবা থাকেন। দুলু আর খোকনও থাকে

ওখানে। ও ঘরটার পেছনে পাকঘর আর কুয়োতলা। কুয়োতলায় যেতে হলে মা-বাবার কামরার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। অন্য কোন পথ নেই।

ভেতরে ঢুকে চারপাশে তাকিয়ে দেখছিলো লিলি।

মরিয়ম বললো, এসো।

ওর নিজের কামরাটায় লিলিকে এনে বসালো মরিয়ম। একপাশে চওড়া একখানা চৌকির ওপর বিছানা পাতা। দুটো বালিশ পাশাপাশি সাজানো। একটা হাসিনার আর একটা মরিয়মের। দেয়ালে ঝোলান আলনার সাথে তাদের কাপড়গুলো সুন্দর করে গোছানো। তার নিচে একটা কেরোসিন কাঠের টেবিল। টেবিলে বই-খাতা রাখা। আর কোন আসবাব নেই ঘরে। আছে একটা মাদুর। ওটা মেঝেতে বিছিয়ে পড়ে ওরা।

বিছানার ওপর এসে বসলো লিলি, এটা বুঝি তোমার ঘর?

হাতের বই-খাতাগুলো টেবিলের ওপর রেখে মরিয়ম জবাব দিলো, হ্যাঁ, হাসিনা আর আমি থাকি এখানে।

এ ঘরে অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে দুলু এসে উঁকি মারছিলো ভেতরে। ওকে দেখে মরিয়ম বললো, দুলু, মা কোথায় রে?

দুলু ভাঙ্গা গলায় বললো, পাকঘরে।

মরিয়ম বললো, আমার ছোট বোন দুলু, সবার ছোট ও।

লিলি কাছে ডাকলো ওকে, এস, এদিকে এস।

ওর ডাক শুনে গুটিগুটি পায়ে পিছিয়ে গেলো দুলু। তারপর ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে গেলো সে।

মরিয়ম বললো, তুমি বসো লিলি, আমি এম্ফুণি আসছি। বলে আলনা থেকে গামছাটা নামিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলো সে।

মায়ের ঘরটা খালি। বাবা অফিস থেকে ফেরেন নি এখনো। খোকন আর হাসিনা স্কুলে। মাহমুদ বোধ হয় এখনো ঘুমুচ্ছে ওর ঘরে। সারা রাত ডিউটি দিয়ে এসে সারাদিন ঘুমোয় ও।

কুয়ো থেকে এক বালতি পানি তুলে, মুখ হাত ধোবার জন্যে কাপড়টা গুটিয়ে নিয়ে ভালো করে বসলো মরিয়ম।

পাকঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে মা শুধালেন, কে এসেছে রে মরিয়ম?

মরিয়ম মুখে পানি ছিটোতে ছিটোতে জবাব দিলো, আমার এক বান্ধবী।

মা জানতে চাইলেন, এক সঙ্গে পড়তো বুঝি?

মরিয়ম বললো, হ্যাঁ।

মা আর কোন প্রশ্ন করলেন না। ভাতগুলো মজে এসেছে, এখনি নামিয়ে ফেন ঢালতে হবে। তারপর জলের কড়াটা চড়িয়ে দিতে হবে চুলোর উপর। মরিয়ম পাকঘরে এসে ঝুঁকে পড়ে বললো, এক কাপ চা দিতে পারবে, মা?

সালেহা বিবি বললেন, দেখি, চা পাতা আছে কিনা, বলে চুলোর পেছনে রাখা কৌটোগুলোর দিকে হাত বাড়ালেন তিনি। অনেকগুলো কৌটা রাখা আছে সেখানে। কোনটাতে মরিচ, কোনটায় হলুদ, রসুন কিংবা পেয়াজ। মাঝখান থেকে একটা তুলে নিয়ে খুলে দেখলেন সালেহা বিবি। তারপর বললেন, দুকাপ আন্দাজ আছে। তুই যা আমি করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। হঠাৎ কি মনে হতে পেছন থেকে তাকে আবার ডাকলেন সালেহা বিবি, শুধু চা দেবো?

কিছু আছে কি? মরিয়ম প্রশ্ন করলো, থাকলে দাও।

মা ঘাড় নাড়লেন, নেই। থাকবার কি উপায় আছে ওই দুলু আর খোকনটার জন্যে। কাল মাহমুদ কিছু বিস্কুট এনেছিলো, সাধ্য কি যে লুকিয়ে রাখবো। আজ সকালে বের করে দুজনে খেয়ে ফেলেছে।

‘যদি পার, বাইরে থেকে কিছু আনিয়ে দিও মা।’ যাবার সময় বলে গেলো মরিয়ম। মায়ের ঘর থেকে সে শুনতে পেলো, ও ঘরে কার সঙ্গে কথা বলছে

লিলি। বোধ হয় হাসিনা ফিরেছে স্কুল থেকে। বাংলাবাজারে পড়ে সে ক্লাস এইটে। লম্বা দোহারা গড়ন। রঙটা শ্যামলা। সরু নাক। মুখটা একটু লম্বাটে ধরনের। বাড়ির অন্য সবার চেয়ে চেহারা একটু ভিন্ন রকমের ওর। চোখ জোড়া বড় হলেও তার মণিগুলো কটা কটা। বাঁ চোখের নিচে একটা সরু কাটা দাগ। ছোটবেলায় দৌড়াপ করতে গিয়ে বাঁটির ওপর পড়ে গিয়ে কেটে গিয়েছিলো। সে চিহ্নটা এখনো মুছে যায় নি।

এ ঘরে এসে মরিয়ম দেখলো লিলির পাশে বসে গল্প জমিয়েছে হাসিনা। আপনার শাড়িটা কত দিয়ে কিনেছেন?

লিলি বললো, মনে নেই, বোধ হয় আঠারো টাকা।

হাসিনা বললো, কি সুন্দর, আমিও কিনবো একখানা। কোথেকে কিনেছেন আপনি?

লিলি জবাব দিলো নিউ মার্কেট থেকে।

হাসিনা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শাড়িটা দেখতে লাগলো। ওর ওই স্বভাব- কারো পরনে একটা ভালো শাড়ি কিংবা ব্লাউজ দেখলে অমনি তার দাম এবং প্রাপ্তিস্থান জানতে চাইবে এবং সেটা কেনার জন্য বায়না ধরবে। কিনে না দিলে কেঁদেকেটে একাকার করবে। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ রাখবে হাসিনা। মরিয়ম এসে বললো, ওর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে কি লিলি ও আমার ছোট বোন হাসিনা।

লিলি হেসে বললো, নতুন করে পরিচয় দিতে হবে না, ও নিজেই আলাপ করে নিয়েছে।

হাসিনা বললো, আপার কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি। বলে হঠাৎ কি মনে হতে ওর দিকে ঘুরে বসে সে আবার বললো, আচ্ছা আপনি বলুন তো, আপা সুন্দর না আমি সুন্দর। ওর প্রশ্ন শুনে হেসে দিলো লিলি। মরিয়ম বললো, নতুন কেউ এলেই ওই এক প্রশ্ন ওর-আপা সুন্দর, না আমি সুন্দর।

ক-দিন বলেছি তুমি সুন্দর, তুমি সুন্দর, আমি কুৎসিত, হলো তো?

গলার স্বর শুনে মনে হলো ও রাগ করেছে। আসলে মনে মনে হাসছে মরিয়ম। কারণ সে জানে যে, হাসিনার চেয়ে ও অনেক বেশি সুন্দর। রঙটা ওর ফর্সা, ধবধবে। মায়ের দেহ-লাবণ্যের উত্তরাধিকারী হয়েছে সে। চেহারাটাও মায়ের মত সুশ্রী। আর চোখজোড়া খুব বড় না হলেও হাসিনার মত কটা নয়।

মা বলেন, ও ঠিক আমার মত হয়েছে, স্বভাবটাও আমারই পেয়েছে সে, আর তোরা হয়েছিস তাদের বাবার মত ছন্নছাড়া।

এ নিয়ে রোজ মায়ের সঙ্গে ঝগড়া বাধায় হাসিনা। বলে, তুমি তো সব সময় ওর প্রশংসাই করো, আমরা যেন কিছু না।

শুনে মা হাসেন।

লিলিও হাসলো আজ। হেসে বললো, মরিয়ম ঠিকই বলেছে। ও দেখতে কুৎসিত। তুমি ওর চেয়ে অনেক সুন্দর হাসিনা।

শুনে হাসিনা বড় খুশি হলো। লিকলিকে বেণিজোড়া দুলিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। বললো, আপনি বসুন, আমি এক্ষুণি আপনার জন্য চা বানিয়ে আনছি। বলে ঘর থেকে বেরুতে যাবে এমন সময় বারান্দায় মাহমুদের তীক্ষ্ণ গলা শোনা গেলো, ক’দিন বলেছি আমার বইপত্র ঘাঁটাঘাটি করিস নে, তবু রোজ তাই করবি। এরপর আমি তোকে মাথার ওপরে তুলে আছাড় মারবো হাসিনা।

হাসিনার খোঁজে এ ঘরে এসে মুহূর্তে চুপসে গেলো মাহমুদ। লিলির দিকে অপ্রস্তুত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো সে। তারপর যেমন হস্তদন্ত হয়ে এসেছিলো, তেমনি দ্রুত বেরিয়ে গেলো।

ও চলে যেতে আঁচলে মুখ চেপে ঘরময় লুটোপুটি খেলো হাসিনা। মরিয়ম ধমকের সুরে বললো, আবার হাসছে দেখ না, লজ্জা-শরম বলে কিছু যদি থাকতো। ক’দিন দাদা নিষেধ করে দিয়েছে ওর বইপত্র না ঘটতে তবু- কথাটা শেষ করলো না মরিয়ম।

একদিন মাহমুদের বই ঘাঁটতে গিয়ে একটা এক টাকার নোট পেয়েছিলো হাসিনা। আরেক দিন একটা আট আনি। সেদিন থেকে যখনি মাহমুদ বাইরে বেরিয়ে যায় তখনি ওর বইপত্র ওলটায় গিয়ে সে। মরিয়মের ধমক খেয়ে চুপ করে গেলো হাসিনা। পরক্ষণে কি মনে হতে লিলির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো, আপনার ক্যামেরা আছে লিলি আপা?

লিলি বললো, কেন ক্যামেরা দিয়ে কি করবে তুমি?

হাসিনা বললো, ছবি তুলবো।

তাই নাকি? লিলি মৃদু হেসে বললো, না ভাই, ক্যামেরা আমার নেই। বিমর্ষ হয়ে লিলির জন্য চা আনতে গেলো হাসিনা।

একটা পিরিচে দুটো সন্দেশ আর দুটো রসগোল্লা। পাশে রাখা দুকাপ গরম চা। দেখে চোখজোড়া বিস্ফারিত হলো হাসিনার। নাচের তালে জোড় ঘুরনী দিয়ে টুপ করে বসে পড়লো সে, মা আমি একটা খাবো। বলে এক মুহূর্তও দেরি না করে পিরিচ থেকে একটা রসগোল্লা তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিলো সে।

সালেহা বিবি কড়াইতে পানি ঢেলে ডাল চড়াচ্ছিলেন, পেছনে তাকিয়ে চোঁচিয়ে উঠলেন তিনি-ওকি হচ্ছে, ওকি হচ্ছে হাসিনা।

রসগোল্লাটা গিলে ফেলে হাসিনা বললো, অমন করছো কেন, একটা তো খেয়েছি, আরো তিনটে আছে।

সালেহা বিবির ইচ্ছে হলো চুলের গোছা ধরে মুখে একটা চড় বসিয়ে দিতে ওর, শুধু তিনটে ইয়ে মেহমানের সামনে কেমন করে দেয়, অ্যাঁ? তাদের নিয়ে আর পারি নে আমি। খাওয়ার জন্য এত হা-হা কেন তাদের, রসগোল্লা কি দেখিস নি জীবনে?

মায়ের ভর্ৎসনা শুনে মুখ কালো করলো হাসিনা। চোখ জোড়া হলহল করে উঠলো ওর। কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, আমায় যে তুমি দেখতে পারো

না তা আমি জানি। আপনার মেহমান এসেছে বলে আজ মিষ্টি আনিয়েছো। আমার কেউ এলে এক কাপ চা-ও দিতে না।

আঁচলে চোখ মুছে ধূপধাপ শব্দ তুলে বেরিয়ে গেলো সে। এখন ছাদে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে হাসিনা।

শুধু একটা সন্দেশ খেলো লিলি।

দুলু এসে উঁকি দিচ্ছিলো দোর গোড়ায়। তার হাতে একটা সন্দেশ তুলে দিলো সে। অবশিষ্ট একটা রসগোলা পড়ে রইলো প্লেটের ওপর। সালেহা বিবি অনুরোধ করলেন, কি হাত তুলে বসে রইলে যে, ওটা খেয়ে নাও।

লিলি বললো, না, আর খাবো না। মিষ্টি বেশি খাই নে আমি। মরিয়ম তুমি খাও। হাসিনা গেলো কোথায়?

মরিয়ম কিছু বলার আগে সালেহা বিবি জবাব দিলেন, কোথায়, ছাদে গিয়ে দৌড়ঝাঁপ দিচ্ছে। বলে আর সেখানে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করলেন না তিনি। চুলোর ওপর ডাল চড়িয়ে এসেছেন সে কথা মনে পড়তে দুলুর হাত ধরে বেরিয়ে গেলেন সালেহা বিবি। দুলুর চোখজোড়া তখনো পিরিচে অসহায়ভাবে পড়ে থাকা রসগোল্লাটার দিকে নিবদ্ধ ছিলো। যাবার পথেও বার কয়েক সেদিকে তাকিয়ে গেলো সে।

শহরে সন্ধ্যা নামার অনেক আগে এখানে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। বাইরে যখন বিকেল এ গলিতে তখন রাত। আর বাইরে যখন ভোর হয় তখনো এ গলিতে তমসায় ঢাকা থাকে। অনেক বাধা ডিঙিয়ে, অনেক প্রাসাদের চুড়ো পেরিয়ে তবে এখানে প্রবেশের অধিকার পায় সূর্য। এ পাড়ার বাসিন্দাদের বড় সাধনার ধন সে। তাই বেলা দুপুরে যখন এক চিলতে রোদ এসে পড়ে এই হীন দালানগুলোর ওপর তখন তার বাসিন্দারা বড় চঞ্চল হয়ে উঠে। ভিজ়ে কাপড়-চোপড়গুলো রোদে বিছিয়ে দেয় তারা। খানিক পরে ধীরে ধীরে আবার সূর্যটা

নেমে যায় পশ্চিমে। কে যেন জোর করে টেনে নিয়ে যায় তাকে। তখন এখানে অন্ধকার। অন্ধকার শুধু। বাইরে চোখ পড়তে লিলি বললো, চলো, এবার উঠা যাক মরিয়ম, রাত হয়ে এলো। মরিয়ম বললো, একটু বসো, মাকে বলে আসি।

গলির মাথায় এসে লিলিকে বিদায় দিলো মরিয়ম। ও বাসায় যাবে এখন। মরিয়ম যাবে নারিন্দায়, ছাত্রী পড়াতে। রিক্সায় উঠে লিলি বললো, কাল আবার দেখা হবে ম্যারি।

আদর করে মাঝে মাঝে মরিয়মকে ম্যারি বলে সম্বোধন করে সে।

ও চলে গেলে কিছুক্ষণ ওদিকে তাকিয়ে রইল মরিয়ম। তারপর মাথার ওপরের কাপড়টা আরো একটু টেনে দিয়ে রাস্তার পাশ ধরে এগিয়ে গেলো সে।

রোজ পায়ে হেঁটে ছাত্রীর বাড়ি যায় মরিয়ম।

পায়ে হেঁটে ফিরে আসে।

রিক্সায় যদি আসা-যাওয়া করে তাহলে হিসেব করে দেখেছে সে যা পায় তার অর্ধেকটা ব্যয় হয়ে যায়। তাছাড়া হাঁটতে যে খুব খারাপ লাগে ওর, তা নয়। মাসের শেষে ত্রিশটা টাকা পাওয়ার আনন্দ হাঁটার ক্লান্তির চেয়ে অনেক বেশি অনেক সুখপ্রদ।

দুপাশের দোকানপাট, লোকজন দেখতে দেখতে এমনি পায়ে চলার পথে অনেক কিছু ভাবে মরিয়ম। বাবার কথা। মায়ের কথা। মাহমুদের কথা। আর নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া সেই বিপর্যয়ের কথা। অনেক কিছু ভাবে মরিয়ম। ইদানীং সেলিনার বড় বোনের দেবর মনসুরের কথাও মাঝে মাঝে ভাবনার মধ্যে এসে যায়। সেলিনা ওর ছাত্রীর নাম।

মনসুর আজকাল বড় বেশি আসা-যাওয়া করছে ওদের বাসায়। প্রায় বিকেলেই আসে। বিশেষ করে মরিয়ম যখন সেলিনাকে পড়াতে যায় তখন। মরিয়ম ভাবে এবার থেকে লোকটা এলে তার সাথে আর কথা বলবে না সে। কে জানে মনে কী আছে লোকটার। কোন বদ উদ্দেশ্যও তো থাকতে পারে।



মানুষের মনের খবর জানা সহজ নয়। জাহেদকে কত কাছ থেকে দেখেছিলো মরিয়ম তবুও কি তার মনের গোপন কথাটি জানতে পেরেছিলো কোনদিন? যদি এক মুহূর্ত আগেও জানতে পারতো তাহলে এমন একটা বিপর্যয় ঘটতে দিতো না মরিয়ম।

দোরগোড়ায় পা দিতেই ভেতরে মনসুরের গলার স্বর শোনা গেলো।

আজ আগে থেকেই এসে বসে আছে লোকটা।

ওর সামনে দিয়ে নিঃশব্দে ভেতরে চলে এলো মরিয়ম।

সোজা সেলিনার ঘরে।

ওর ঘরটা বড় সুন্দর করে সাজানো আর বেশ পরিপাটি। একপাশে নতুন কেনা একখানা খাটের উপর সেলিনার বিছানা। নীল রঙের একখানা বেড কভার দিয়ে ঢাকা। মাথার কাছে একটা গোল টিপয়, তার উপর ফুলদানিতে বহু বর্ণের ফুল সাজানো। দেখে মনে হয় তাজা ফুল। আসলে কাগজের তৈরি।

দেয়ালে কয়েকখানা ছবি টাঙ্গানো। কোন এক শিল্পীর আঁকা একখানা পোর্ট্রেট।

এ ঘরে ছিলো না সেলিনা। খবর পেয়ে এসে কপালে হাতের তালু ঠেকিয়ে বললো, আজ পড়বো না আপা, শরীরটা ভালো লাগছে না।

মরিয়ম সহানুভূতির সাথে বললো, কি হয়েছে?

ধপ করে বিছানার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে সেলিনা জবাব দিলো, মাথাটা ভীষণ ধরেছে আপা।

মরিয়ম জানে এটা মিথ্যে কথা। যেদিন পড়ায় ফাঁকি দেবার ইচ্ছে থাকে সেদিন একটা কিছু ছুতো বের করে বসে সেলিনা। কোনদিন মাথা ব্যথা। কোনদিন পেট কামড়। কোনদিন বমি বমি ভাব। মরিয়ম কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, সত্যি তোমার মাথা ব্যথা করছে সেলিনা?

সেলিনা পাশ ফিরে শুয়ে বললো, তুমি সব সময় আমায় সন্দেহ কর  
আপা।

মরিয়ম বললো, এতদূর হেঁটে এসে না পড়িয়ে ফিরে যেতে আমার খারাপ  
লাগে কিনা, তাই।

ওই যা, হঠাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সেলিনা, তুমি বসো আপা,  
আমি এক্ষুণি আসছি। বলে দ্রুত বেরিয়ে গেলো সে। খানিকক্ষণ পরে আবার  
ফিরে এলো। হাতে তিনখানা দশ টাকার নোট। মরিয়মের হাতে নোটগুলো গুঁজে  
দিয়ে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লো সেলিনা, সত্যি বলছি আপা, মাথাটা আজ  
ভীষণ ধরেছে।

মরিয়ম জানে হাজার বুঝালেও, ওকে আর এখন পড়াতে বসানো যাবে  
না। এখানে বুঝি হাসিনার সঙ্গে মিল আছে ওর। হাসিনাও এমনি ফাঁকি দেয়  
লেখাপড়ায়। গালাগাল করেও বইয়ের সামনে বসানো যায় না। এঘর থেকে  
ওঘরে পালিয়ে বেড়ায়। ছাদে গিয়ে বসে থাকে।

বাবা বলেন, ছোট বেলায় তোমরাও এমন ছিলে। এখনও কম বয়স ওর,  
বুদ্ধি হয় নি, বুদ্ধি হলে তখন আর বকবিকি করতে হবে না; আপনা থেকেই  
পড়াতে বসবে।

মা বলেন, ওর বুঝি অল্প বয়স? আসছে মাসে তেরো পেরিয়ে চৌদ্দয়  
পড়বে। ও বয়সে মরিয়মকে দেখি নি। ওকে পড়াতে বলতে হতো? আসলে তুমি  
ওকে বড় বেশি লাই দিচ্ছে। দেখবে ওর কিছু হবে না জীবনে।

বাবা সব সময় হাসিনার পক্ষ নেন। মা মরিয়মের। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে  
কথাই ভাবছিলো মরিয়ম।

সেলিনা জিজ্ঞেস করলো, কি ভাবছো আপা?

না, কিছু না। হাতের নোটগুলো ব্যাগের মধ্যে রেখে দিয়ে মরিয়ম বললো, তাহলে আমি চলি সেলিনা, তোমার মাকে বলো আমি এসেছিলাম। কাল আবার দেখা হবে, কেমন?

সেলিনা পাশ ফিরে শুয়ে অস্পষ্ট স্বরে বললো, আচ্ছা।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে পা বাড়াতে গতি যেন ক্লান্ত হয়ে এলো তার। বৈঠকখানা ছেড়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনসুর। লম্বা গড়ন। সরু দেহ। পরনে একটা ঢোলা পায়জামা আর গায়ে ঘি রঙের মিহি পাঞ্জাবি। পায়ের শব্দে ওর দিকে ফিরে তাকালো মনসুর। একেবারে ওর মুখোমুখি। চোখজোড়া মাটিতে নামিয়ে নিয়ে ওর পাশ কেটে চলে যাবে ভাবছিলো মরিয়ম।

একি এসেই ফিরে চললেন যে? চলার পথে তার প্রতিরোধ করলো মনসুর।

সেলিনা আজ পড়বে না। ছোট্ট উত্তরটা দিয়ে চলে যাচ্ছিলো মরিয়ম।

মনসুর বললো, চলুন আমিও যাবো ওপথে।

ওর নিজের তরফ থেকে কোন আমন্তরণ না জানালেও, কিছুদূর পিছুপিছু তারপর পাশাপাশি রাস্তায় নেমে এলো মনসুর।

আজ প্রথম নয়। এর আগেও এ ধরনের প্রস্তাব সে পেয়েছে মনসুরের কাছ থেকে। শুধু প্রস্তাব নয়, মরিয়মকে বাসার কাছাকাছি এগিয়ে দিয়েও গেছে সে।

মরিয়মের ভালো লাগে নি। বড় বিরক্তিকর মনে হয়েছে এই অনাহত সঙ্গদান। কথাবার্তা যে খুব হয়েছে রাস্তায় তা নয়। একদিন জিজ্ঞেস করছিলো, মরিয়ম কোথায় থাকে। আর একদিন জানতে চেয়েছিলো, পরীক্ষা কেমন দিয়েছে মরিয়ম। এছাড়া এমনও দিন গেছে, যে দিন সারা পথ নীরবে হেটেছে ওরা। বাসার কাছাকাছি তেমাথায় এসে মনসুর বলেছে আচ্ছা আসি এবার। আপনি তো ও পথে যাবেন, আমি এ পথে। কিছুদূর গিয়ে লোকটা রিক্সা নিয়েছে তা ঠিক

লক্ষ্য করেছে মরিয়ম। মরিয়ম জানে বেশ টাকা-পয়সা আছে লোকটার, রিক্সা কেন ইচ্ছা করলে মোটরে চড়ে চলাফেরা করতে পারে। তবু এ পথটা মরিয়মের সঙ্গে হেঁটে আসতো মনসুর।

রাস্তায় নেমে মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিলো মরিয়ম; কেন সে নিষেধ করলো না লোকটাকে? ইচ্ছে করলে তো মুখের ওপর জবাব দিতে পারতো। বলতে পারতো আপনি সঙ্গে আসুন তা পছন্দ হয় না আমার। দয়া করে আর পিছু নেবেন না। ইচ্ছে করলে আরো রুঢ় গলায় আসতে নিষেধ করতে পারতো মরিয়ম। তবু কেন, একটা কথাও বলতে পারলো না সে?

পাশাপাশি আসছিলো মনসুর। ইতিমধ্যে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে আগুন ধরিয়েছে সে। বার কয়েক তাকিয়েছে মরিয়মের দিকে। মৃদু ঘামছিলো মরিয়ম।

হঠাৎ হাত বাড়িয়ে একটা রিক্সা থামালো সে। মনসুরকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে অনেকটা তাড়াহুড়ার সাথে রিক্সায় উঠে বসলো মরিয়ম।

বেশ কিছুদূর আসার পর একবার পেছন ফিরে তাকালো সে। দেখলো এদিকে চেয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে মনসুর। দেখে প্রথমে হাসি পেলো তার। হেসে নিয়ে সে ভাবলো এমন ব্যবহারটা হয়তো উচিত হয় নি। লোকটা তাকে অভদ্র বলে মনে করতে পারে কিংবা অতি দাম্ভিক। এর কোনটিই নয় মরিয়ম। মনসুরের এই গায়েপড়াভাব তার ভালো লাগে না, এটাই হলো আসল কথা। কথাটা মনসুরকে ভদ্রভাবে বলে দিলেও তো পারতো সে। তাই ভালো ছিলো হয়তো। একটু আগের অবাস্তিত ঘটনার জন্যে মনে মনে অনুতপ্ত হলো মরিয়ম। কিন্তু পরক্ষণে আবার মনে হলো, সে অন্যায় কিছু করে নি। জাহেদের সঙ্গেও এমনি রুঢ় ব্যবহার করা উচিত ছিলো তার। পারে নি বলেই মরিয়মকে তার শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে আজও। সব পুরুষই সমান। ওরা চায় শুধু ভোগ

করতে। প্রেমের কোন মূল্যই নেই ওদের কাছে। আর এই দেহটাকে পাবার জন্য কত রকম অভিনয়ই না করতে পারে ওরা।

গলির মাথায় রিক্সাটাকে বিদায় দিয়ে দিলো মরিয়ম।

এ পথটা হেঁটে যেতে হবে তাকে।

অন্ধকার গলিতে বিজলী বাতির প্রসার এখনো হয় নি। কয়েকটা কেরোসিনের বাতি আছে। টিমটিম করে সেগুলো জ্বলে। তাও সব সময় নয়। মাঝে মাঝে দুই ছেলেরা ঢিল মেরে চিমনিগুলো ভেঙ্গে দেয়। তখন অন্ধকারে ডুবে থাকে গলিটা।

বাঁ হাতে শাড়িটা গুটিয়ে নিয়ে আবর্জনার স্তুপগুলি এড়িয়ে সাবধানে এগুতে লাগলো মরিয়ম। দুপাশে জীর্ণ দালানগুলোতে এর মধ্যে ঘুমের আয়োজন চলছে। সামনের বারান্দায় বসে কেউ কেউ গল্প করছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সুর করে পড়ার আওয়াজও আসছে এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে। বুড়োদের সাংসারিক আলাপ-আলোচনা। আদেশ-উপদেশ। আশাআকাজক্ষার অভিব্যক্তিগুলোও গলি বেয়ে হাঁটতে গেলে সহজেই কানে আসে।

বাসার কাছাকাছি আসতে ও পাশের দোতলা বাড়ি থেকে ঝপ্ করে এক বালতি পানি কে যেন ঢেলে দিলো মরিয়মের গায়ে। সর্বাঙ্গ ভিজে গেলো। প্রথম কয়েক মুহূর্ত একেবারে হকচকিয়ে গেলো মরিয়ম। মুখ তুলে উপরের দিকে তাকাতে দেখলো, যে পানি ফেললো সে এইমাত্র মুখখানা সরিয়ে নিয়ে গেলো তার। এমনি প্রায় হয়। রাস্তায় কেউ আছে কি নেই দেখে না তারা। ময়লা আবর্জনা এমন কি বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের পায়খানাও জানালা গলিয়ে রাস্তায় ফেলে দেয়। কারো মাথায় পড়লো কিনা লক্ষ্য নেই। রাগে সমস্ত দেহ জ্বালা করে উঠলো মরিয়মের। পরক্ষণে রীতিমত কান্না পেলো তার। সবে গতকাল শাড়িটা ধুয়ে পরেছে। কে জানে কিসের পানি। ভাবতে গিয়ে সারা দেহ রিরি করে উঠলো। মনে হলো সে এক্সুগি বমি করবে।

ওকে দেখে হাসিনা হট্টগোল বাঁধিয়ে দিলো। একি আপা ভিজে চুপসে গেছিস যে? কি হয়েছে অ্যাঁ। উপর থেকে পানি ফেলেছে বুঝি, এ হে হে, কি নোংরা পানি গো। মেঝেতে থুথু ফেললো হাসিনা। ওমা, মা, দেখে যাও।

মরিয়ম স্যান্ডেলজোড়া দ্রুত খুলে রেখে কুয়োতলার দিকে যেতে যেতে বললো, আমার ছাপা শাড়িটা আর গামছাটা একটু দিয়ে যা হাসিনা।

মা নামাজ পড়ছিলেন।

বাবা হ্যারিকেনের আলোয় বসে খোকনকে পড়াচ্ছিলেন। ‘হুমায়ূনের মৃত্যুর পর আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।’ হাসিনার চিৎকার শুনে এবং মরিয়মের সাবান নিয়ে কুয়োতলার দিকে তাড়াহুড়া করে চলে যেতে দেখে বই থেকে মুখ তুলে তাকালেন তিনি, কি হয়েছে অ্যাঁ। কী হয়েছে? মরিয়ম কিছু বললো না।

শাড়ি আর গামছা হাতে চাপা আক্রোশে পাড়ার লোকদের যমের বাড়ি পাঠাতে পাঠাতে একটু পরে এ ঘরে এল হাসিনা।

হাসমত আলী আবার মুখ তুললেন, বই থেকে, কি হয়েছে অ্যাঁ?

হাসিনা মুখ বিকৃত করে বললো, আপনার গায়ে কারা নোংরা পানি ঢেলে দিয়েছে।

কারা ঢাললো কোথায় ঢাললো? হাসমত আলী ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। হাসিনা কুয়োতলায় শাড়ি আর গামছাটা রেখে এসে বললো, আপা আসছিলো, উপর থেকে কারা এক বালতি পানি ঢেলে দিয়েছে ওর গায়ে।

হাসমত আলী শুনে বললেন, চোখ বন্ধ করে হাঁটে নাকি, দেখে হাঁটতে পারে না।

তোমার যত বেয়াড়া কথা। নামাজের সালাম ফিরিয়ে সালেহা বিবি বললেন, উপর থেকে যারা ময়লা পানি ফেলে তাদের চোখ কি কানা হয়েছে? তারা মানুষ দেখে না? খোদা কি তাদের চোখ দেয় নি?

স্ত্রীর কথায় প্রতিবাদ না করে চুপ হয়ে গেলেন হাসমত আলী। একটুকাল নীরব থেকে সালেহা বিবি বাকি নামাজটা শেষ করবার জন্যে নিয়ত বাধলেন। সহজে ঘটনাটার ইতি করে দিয়ে হাসিনা শান্তি পাচ্ছিলো না। সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে এসে পাশের বাড়ির বউটিকে ডেকে সব কিছু শোনালো সে। আপা আসছিলেন হঠাৎ তার মাথায় এক বালতি ময়লা পানি ঢেলে দিয়েছে কে। আল্লা করুণ, যে হাতে পানি ঢেলেছে সে হাতে কুষ্ঠ হোক তার, কুষ্ঠ হয়ে মরুক।

উত্তরে, পাশের বাড়ির বউটি জানালো—কিছুদিন আগে তার ছোট দেবর আসছিলো এমনি রাতে, তার মাথার উপর একরাশ ছাই ফেলে দিয়েছিলো। লোকগুলো সব ইয়ে—।

নিচে এসে হাসিনা দেখলো মরিয়ম স্নান সেরে ফিরে এসেছে। বসে বসে চুলে চিরুনি বুলাচ্ছে সে। সামনে টেবিলের ওপর তিনখানা দশ টাকার নোট। দেখে চোখজোড়া বড় বড় করে ফেললো হাসিনা। তারপর ছোঁ মেরে নোটগুলো তুলে নিয়ে বললো, তুই বুঝি আজ টাকা পেয়েছিস আপা? আমাকে লিলি আপার মত একটা শাড়ি কিনে দিতে হবে, নইলে আমি এগুলো আর দেবো না,—সত্যি দেবো না বলছি, কিনে দিবি কিনা বল না আপা। দুহাতে মরিয়মকে জড়িয়ে ধরলো হাসিনা। মরিয়ম বললো, এখন না, স্কুলের চাকরিটা যদি পেয়ে যাই তাহলে কিনে দেবো, কথা দিলাম।

তার কোন ঠিক-ঠিকানা আছে? অনিশ্চয়-নির্ভর হতে রাজী হলো না হাসিনা। কবে যে চাকরি হবে—হয় কি না তাই কে জানে। শাড়ি যদি না কিসে দিস, একটা ব্লাউজ পিস কিনে দিবি বল?

মরিয়ম কথা দিলো, একটা ব্লাউজ-পিস সে কিনে দেবে। আশ্বস্ত হয়ে টাকাগুলো ফিরিয়ে দিতে রাজী হলো হাসিনা। কিন্তু তক্ষুণি দিলো না, ওগুলো কিছুক্ষণ থাকে ওর কাছে। হাতে নিয়ে, আঁচলে বেঁধে ব্লাউজের মধ্যে রেখে এবং আবার বের করে নানাভাবে নোটগুলোর উষ্ণতা অনুভব করলো সে।

ভাত খেতে বসে সালেহা বিবি বললেন, দে ওগুলো ট্রান্সে রেখে দি, তোর কোন ঠিক আছে, কোথায় হারিয়ে ফেলবি। দে এদিকে।

এক লোকমা ভাত মুখে তুলে দিয়ে হাসিনা সরোষ দৃষ্টিতে তাকালো মায়ের দিকে, তারপর নীরবে ভাতগুলো চিবোতে লাগলো।

গোল হয়ে তারা বসেছিলো খেতে। বুড়ো হাসমত আলী, আর তার দুই মেয়ে মরিয়ম আর হাসিনা। সালেহা বিবিও খাচ্ছিলেন এবং পরিবেশন করছিলেন সকলকে। খোকন আর দুলু খেয়েদেয়ে অনেক আগে শুয়ে পড়েছে। মাহমুদ রোজ সন্ধ্যায় বেরিয়ে যায় ডিউটিতে, ফেরে সেই ভোর রাতে। আজ তার অফ-ডে। তবু রাত এগারোটার আগে ফিরবে না সে। অফিসে, রেস্টোঁরায় বন্ধুদের বাড়িতে আড্ডা দিয়ে তবে ফিরবে বাসায়। খাবারটা ওর ঘরে ঢেকে রেখে দেন সালেহা বিবি। ফিরে এসে খেয়ে ঘুমোয় মাহমুদ।

মরিয়মের পাতে এক চামচ ঝোল পরিবেশন করে সালেহা বিবি বললেন, কাল গিয়ে একখানা শাড়ি কিনে এনো নিজের জন্যে। একটা বাড়তি শাড়ি নেই—

মরিয়ম কিছু বলবার আগে হাসিনা জবাব দিলো, আর আমার জন্যে একটা ব্লাউজ-পিস।

সালেহা বিবি ধমকে উঠলেন, ওসব বাজে আবদার করো না।

হাসিনা সরোষ দৃষ্টিতে আরেকবার তাকালো মায়ের দিকে।

হাসমত আলী এতক্ষণ নীরবে ভাত খাচ্ছিলেন, সামনের দুটো দাঁত পড়ে গেছে বহু আগে, উপর পাটির দাঁতগুলো বড় নড়বড়ে, যে-কোন মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে, তাই কতার সাথে ভাত খান খুব আস্তে আস্তে। দাঁতের ফাঁকে আটকে-যাওয়া একটা সরু কাঁটা আঙুল দিয়ে বের করে নিয়ে হাসমত আলী বললেন, তোমার স্কুলের চাকরিটার কি হলো?

কথাটি মরিয়মকে উদ্দেশ্য করে।



মুখের কাছে তুলে আনা হাতের গ্লাসটা থালায় ওপর নামিয়ে রেখে বাবার দিকে চালো মরিয়ম। বাবার প্রশ্নটা যেন ঠিক বুঝতে পারে নি সে।

ওকে চুপ থাকতে দেখে হাসিনা বললো, তোর স্কুলের চাকরিটার কি হলো জিজ্ঞেস করছেন বাবা। এতক্ষণ কি ভাবছিলি আপা?

মরিয়ম অপ্রতিভ গলায় জবাব দিলো, তিন-চার দিনের মধ্যে জানা যাবে। বলে ভাতের থালায় মুখ নামালো সে। এতক্ষণ সেই অবাস্তব ঘটনাটির কথা ভাবছিলো মরিয়ম। সত্যি মনসুরের সঙ্গে অমন বিশ্রী ব্যবহার না করলেই ভালো হতো। কে জানে, লোকটার হয়তো কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিলো না। নেইও। মরিয়ম মিছামিছি সন্দেহ করছে তাকেই নিজের অশোভনতার জন্যে মনে মনে লজ্জিত হলো সে।

খাওয়া হলে পরে, রোজ এঁটো থালা-বাসনগুলো ধুয়ে-মুছে গুছিয়ে রাখার কাজে মাকে সহায়তা করে মরিয়ম।

সালেহা বিবি মেয়ে-ভাগ্যে সুখ অনুভব করলেও মাঝে মাঝে বাধা দিয়ে বলেন, থাক না, এগুলো আমিই করবো, তুই ঘরে যা।

মরিয়ম বলে, তুমি সারাদিন খাটো মা, তুমি যাও। ওগুলো আমি গুছিয়ে রাখবো।

আনন্দে মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সালেহা বিবির। মেয়ে তাঁর দুঃখ কষ্ট বোঝে। তাঁর শ্রমের স্বীকৃতি দেয়। এতেই তাঁর আনন্দ। তারা সুখী হোক। মা-বাবাকে সন্তুষ্ট রাখুক, এই চান তিনি। আর বেশি কিছু নয়।

খেয়েদেয়ে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছিলো মরিয়ম।

হাসিনা বসে বসে পড়ছিলো, নিচে মাদুর পেতে। বুকের নিচে একটা বালিশ রেখে আড় হয়ে শুয়ে পড়ে সে। পড়ার ফাঁকে, মাঝে মাঝে একটু ঘুমিয়ে নেয়। জেগে আবার পড়ে। আবার ঘুমোয়। এ তার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।

এ জন্যে ওকে ধমকায় মরিয়ম। আজও ধমকালো, ও কী হচ্ছে, উঠে  
সিঁধে হয়ে বসে পড়। শুয়ে শুয়ে পড়তে নেই ক’দিন বলেছি তোমায়?

বই থেকে মুখ না তুলেই হাসিনা জবাব দিলো, আমার যেভাবে ভালো  
লাগবে সেভাবে পড়বো, তোমার তাতে কি?

মরিয়ম বললো, এভাবে পড়লে বুকে ব্যথা করবে।

করুক, তাতে তোমার কি? বইটা বন্ধ করে রেখে একটু ঘুমিয়ে নেবার  
জন্যে বালিশে মাথা রাখলো হাসিনা। মরিয়ম কী যেন বলতে যাচ্ছিলো। দুয়ারে  
কড়া নাড়ার শব্দ হতে কথাটা আর বললো না উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলো।

মাহমুদ এসেছে বাইরে থেকে বগলে কতকগুলো বই। হাতে একটা  
কাগজের মোড়ক। মোড়কটা ওর হাতে তুলে দিয়ে মাহমুদ বললো, নাও, এটা  
তোমাদের জন্যে এনেছি।

মরিয়ম সকৌতুকে তাকিয়ে বললো, এর মধ্যে কী?

কী, তা আলোতে নিয়ে গিয়ে দেখতে পাচ্ছে না? বিরক্ত গলায় জবাব  
দিলো মাহমুদ। যাও একটা বাতি নিয়ে এসো চটপট করে।

ওঘর থেকে সব শুনতে পেয়ে বাতি হাতে দৌড়ে এলো হাসিনা, কি  
এনেছেরে আপা, দেখি দেখি।

দাঁড়াও দেখবে, অমন আদেখলেপনা করো না। এসব ভালো লাগে না  
আমার।

নিজের ঘরে এসে বইগুলো মেঝেতে নামিয়ে রাখলো মাহমুদ। তার ঘরে  
কোন আসবাবপত্র নেই। একটা কাপড় রাখার আলনাও নয়। মেঝেতে পাশাপাশি  
তিনটে মোটা মাদুর বিছানো। এক পাশে তার স্তম্ভীকৃত খবরের কাগজ। তায়ে  
তায়ে রাখা। বাকি তিন পাশে শুধু বই, মাঝখানে ওর শোবার বিছানা। বিছানা  
বলতে একটা সতরঞ্জি, একটা চাদর আর একটা বালিশ।

মরিয়মের হাত থেকে মোড়কটা নিয়ে ওদের বসতে বললো মাহমুদ।  
নিজেও বসলো। তারপর আস্তে করে বললো, এর ভেতরে কী আছে তা দেখবার  
আগে তোমাদের কিছু বলতে চাই আমি।

হাসিনা ফিক করে হেসে দিয়ে বললো, বলো।

মরিয়ম গম্ভীর।

মাহমুদ ওদের দুজনের দিকে ক্ষণকাল স্থিরচোখে তাকিয়ে থেকে বললো,  
দুর্ঘটনাবশত হোক আর যেমন করেই হোক, তোমরা আমার বোন। তাই নয়  
কি?

হাসিনা আঁচলে মুখ টিপে বললো, হ্যাঁ।

মরিয়ম কিছু বললো না। নীরবে মাথা নাড়লো।

মাহমুদ আবার বললো, তোমাদের প্রতি আমার একটা বিশেষ দায়িত্ব  
আছে, তা বিশ্বাস করো?

দুজনে ঘাড় নোয়ালো ওরা। হ্যাঁ।

মোড়কটা খুলতে খুলতে মাহমুদ বললো, তোমাদের জন্য কিছু চুলের  
ফিতা আর মাথার কাটা এনেছি আমি। দেখো পছন্দ হয় কিনা?

ফিতাজোড়া মাহমুদের হাত থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে খুশিতে উজ্জ্বল  
হয়ে উঠে হাসিনা বললো, কি সুন্দর নাচতে নাচতে মাকে দেখাবার জন্যে নিয়ে  
গেলো সে।

মরিয়ম উঠলো, মাহমুদ বললো, বসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার।

মরিয়ম বললো, তুমি ভাত খাবে না?

না, এক বন্ধুর বাসা থেকে খেয়ে এসেছি আমি। মাথা নেড়ে ওকে নিষেধ  
করলো মাহমুদ। তোমার সঙ্গে যে মেয়েটি আজ এসেছিলো সে কে জানতে পারি  
কি? অবশ্য তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে।

মরিয়ম বললো, ওর নাম লিলি, আমার সঙ্গে পড়তো কলেজে।

মাহমুদ বললো, থাক তার নাম আমি জানতে চাই নি। জানতে চেয়েছিলাম ওর সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কি, জেনে খুশি হলাম।

সহসা দুজন ওরা নীরব হয়ে গেলো। পাশের ঘর থেকে মা, বাবা আর হাসিনার গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মৌনতা ভেঙ্গে মাহমুদ বললো, তুমি কি করবে ঠিক করেছে?

মরিয়ম বললো, এখনো কিছু ঠিক করি নি, দেখি স্কুলের চাকরিটার কি হয়।

মাহমুদ বললো, তোমার বান্ধবী লিলি না কি নাম বললে, সে কি করে শুনি?

মরিয়ম দাদার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো, সেও একটা চাকরির খোঁজে আছে।

হুঁ। মাহমুদ ক্ষণকাল চুপ থেকে বললো, যাও, এখন ঘুমোবো আমি।

কাগজে মোড়ানো চুলের কাটাগুলো তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলো মরিয়ম। ও চলে গেলে একটা সিগারেট ধরিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো মাহমুদ। হাত বাড়িয়ে মাথার কাছে রাখা হ্যারিকেনটা নিভিয়ে দিলো সে।

এখন সমস্ত ঘরটা অন্ধকারে ঢাকা।

চারপাশে তাকালে এই অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

সিগারেটের মাথায় শুধু এক টুকরো আলো। বিড়ালের চোখের মত জ্বলছে। ভাষা নামক মানুষের আদিম প্রবৃত্তিও বোধ হয় চিরন্তন এমনি করে জ্বলে। পাশ ফিরে শুয়ে মাহমুদ ভাবলো। প্রধান সম্পাদক আজ কথা দিয়েছেন, আসছে মাস থেকে দশ টাকা বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হবে তার। যদি তিনি তার কথা রাখেন তাহলে, এই বাড়তি দশ টাকা প্রতি মাসে ভাই বোনদের জন্যে খরচ করবে মাহমুদ। আর যদি ছলনার নামান্তর হয়, তাহলে?

আর ভাবতে ভালো লাগে না মাহমুদের। সিগারেটটা অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করে সে। কিন্তু সহসা তার ঘুম আসে না। সহস্র চিন্তা এসে মনের কোণে ভিড় জমায়। মাঝে মাঝে মনে হয় রোজ রাতে এমনি এমনি ভাবনার জাল বুনতে বুনতে হয়তো জীবনটা একদিন শেষ হয়ে যাবে তার। জ্বলে জ্বলে ক্ষয়ে যাওয়া মোমবাতির মত ধীরে ধীরে ফুরিয়ে যাবে সবকিছু।

নিউজ সেকশনের লম্বা ঘরটা এখন চোখের ওপর ভাসে।

অনেক আশা নিয়ে একদিন ‘মিলন’ পত্রিকায় চাকরি নিয়েছিলো মাহমুদ। সাব-এডিটরের চাকরি। মাসে পঞ্চাশ টাকা বেতন। অর্থের চেয়ে আদর্শ সাংবাদিক হওয়ার বাসনাই ছিলো প্রবল। কালে কালে একদিন লুই ফিশার হবে।

শুনে সিনিয়ার সাব-এডিটর আমজাদ হোসেন শব্দ করে হেসে উঠেছিলেন সেদিন। লুই ফিশার হবে? বেশ বেশ। অতি উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা বটে। বছর খানেক কাজ করো। তারপর লুই ফিশার কি চিংড়ি ফিশার দুটোর একটা নিশ্চয় হতে পারবে।

বুড়োটার ওপর চোখ-মুখ লাল হয়ে গিয়েছিলো মাহমুদের। গালাগাল দিতে ইচ্ছে করছিলো তাকে।

আহা, শুধু শুধু বেচারাকে অমন হতাশ করে দিচ্ছেন কেন?

আরেকজন বলেছিলো, টেবিলের ওপাশ থেকে।

তারপর।

তারপর আর ভাবতে পারে না মাহমুদ। একটু পরে ঘুমিয়ে পড়ে সে।

সকালে ঘুম ভাঙতে মুখ-হাত ধুয়ে বাইরে বেরুবে বলে ভাবছিলো মাহমুদ। এক টুকরো পাউরুটি আর এক কাপ চা এনে ওর সামনে নামিয়ে রেখে সালেহা বিবি বললেন, তুই কি বেরুবি এখন?

হ্যাঁ, দড়িতে ঝুলিয়ে রাখা জামা নাবিয়ে নিয়ে মাহমুদ বললো, আমায় একটা কাজে যেতে হবে।

খানিকক্ষণ ইতস্তত করে সালেহা বিবি বললেন, তোর বাবার শরীরটা আজ ভালো নেই। বাজারটা একটু দিয়ে যা।

মাহমুদ কোন জবাব দিলো না তার কথার। যেন শুনতে পায় নি এমনি ভাব করে নীরবে পাউরুটির টুকরোটা ছিঁড়ে খেতে লাগলো সে। মা আবার বললেন, কিরে কিছু বলছিস না। যে? টাকা আনবো?

‘না।’ মাহমুদ নির্বিকারভাবে জবাব দিলো, আমার কাজ আছে বললাম তো।

কোনদিন তোর কাজ না থাকে? সালেহা বিবি গভীর হয়ে গেলেন। বুড়োটা রোজ বাজার করে এনে খাওয়ায়, এ বুড়ো বয়সে তাকে কষ্ট দিতে লজ্জা হয় না তোদের?

রুটির টুকরোটা পিরিচের উপর নামিয়ে রেখে মাহমুদ বললো, আর আমি আহ্লাদে ঘুরে বেড়াই তাই না মা? রাতের পর রাত যে আমায় তোমাদের জন্য জেগে কাজ করতে হয় তার কোন মূল্য নেই, না? চায়ের পেয়ালাটা সামনে থেকে সরিয়ে দিলো মাহমুদ। রুটির পিরচটাও দূরে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে।

রাগে চোখ-মুখ লাল হয়ে গেলো সালেহা বিবির। উষঃ গলায় তিনি জবাব দিলেন, তুই সারারাত জেগে কাজ করিস আর বুড়োটা কি বসে খায়? সারা জীবনে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে রোজগার করে এনে খাইয়েছেন।

হয়েছে, এবার থামো তুমি মা। জামাটা গায়ে দিতে দিতে জবাব দিলো মাহমুদ, ও কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। তবু রোজ এক বার শোনাতে তুমি।

ওকি, চা-টা কি অপরাধ করলো? খেয়ে নে না। ওটা। বাজারের প্রসঙ্গ ভুলে গিয়ে ছেলেকে চা খাওয়ানোর প্রতি লক্ষ্য দিলেন সালেহা বিবি। ওকি, চলে যাচ্ছিস কেনো, চা-টা খেয়ে যা।

থাক, ওটা তুমি খাওগে।। হনহন করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো মাহমুদ।  
ও চলে যেতে ক্ষোভে দুঃখে চোখ ফেটে কান্না এলো সালেহা বিবির। আঁচলে  
চোখ মুছে ব্যথা জড়ানো স্বরে নিজেকে ধিক্কার দিলেন তিনি, কোন দুঃখে পেটে  
ধরেছিলাম তোদের।

কথাটা কানে এলো হাসমত আলীর। ও ঘর থেকে গলা উচিয়ে জিজ্ঞেস  
করলেন, কী হয়েছে?

স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনে নীরব হয়ে গেলেন সালেহা বিবি। এসব কথা  
স্বামীকে জানতে দিতে চান না। তিনি। তাহলে তিনি মনে আঘাত পাবেন। হাসমত  
আলীও কোন উত্তর না পেয়ে চুপ করে গেলেন।

মরিয়ম এসে বললো, একটু পরে আমি বাইরে বেরুবো মা। বাজারের  
টাকাটা দিয়ে দিও।

মা অবাক হয়ে বললেন, তুই যাবি?

মরিয়ম বললো, তাতে কিছু এসে যাবে না, খোকনকে সঙ্গে দিও।

হাসমত আলী এতক্ষণ মা-মেয়ের আলাপ শুনছিলেন, শেষ হলে বললেন,  
ও কেন, আমি যাবো বাজারে।

সালেহা বিবি বললেন, তোমার শরীর খারাপ লাগছে, বলেছিলে না?

ও, কিছু না। আস্তে আস্তে জবাব দিলো হাসমত আলী।

ঘর থেকে সেই যে হন হন করে বেরিয়ে এলো মাহমুদ, তারপর  
অনেকপথ মাড়িয়ে এ গলি ও গলি পেরিয়ে, বিশ্রামাগারের সামনে এসে দাঁড়ালো  
সে। দুটো বাই লেন এসে যেখানে মিলেছে তারই সামনে একটি ছোট রেষ্টোরাঁ।  
ভেতরে ঢুকতে কেরোসিন কাঠের কাউন্টারের ওপার থেকে ম্যানেজার খোদাবক্স  
বলে উঠলো, ইয়ে হয়েছে মাহমুদ সাহেব, আজকের খবরের কাগজ পড়েছেন?

কোণের টেবিলে তিনটে ছেলে গোল হয়ে বসেছিলো, তাদের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে মাহমুদ জবাব দিলো, না, আজকের কাগজ তো আমি পড়িনি। ওর গলার স্বরটা রুক্ষ।

খোদাবক্স বুঝতে পারলো আজ মেজাজটা ভাল নেই ওর। তাই গলাটা আরো একটু মোলায়েম করে বললো, একটা ভালো চাকরির বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে আজ।

মাহমুদ কিছু বলার আগেই বাকি তিনজন একসঙ্গে কথা বলে উঠলো, তাই নাকি, দেখি দেখি পত্রিকাটা।

কোলের ওপর থেকে পত্রিকাটা নিয়ে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিলো খোদাবক্স। তার খদ্দেরদের বেকারত্ব ঘুচুক, তারা ভালো চাকরি পাক এটা সে আন্তরিকভাবে কামনা করে। অবশ্য ভালো চাকরি পেলে হয়তো এ রেস্টোরাঁয় আর আসবে না, অভিজাত রেস্টোরাঁয় গিয়ে চা খাবে। এদিক থেকে ওদের হারাবার ভয়ও আছে খোদাবক্সের। কিন্তু বাকি টাকাগুলো ওদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে, এই তার সান্ত্বনা। তাছাড়া ভালো চাকরি পেলেই যে ওরা তাকে ত্যাগ করবে সেটা ভাবাও ভুল। হাজার হােক চক্ষু লজ্জা বলে একটা প্রবৃত্তি আছে মানুষের। দুর্দিনে ওদের বাকিতে খাইয়েছে খোদাবক্স, সে কথা কি এত সহজে ভুলে যাবে ওরা? অবশ্য না-ছেড়ে যাবার আরেকটা কারণ আছে।

সেটা হলো শ'খানেক হাত দূরের মেয়ে-স্কুলের ওই লাল দালানটা। ওখানকার সব খবরই রাখে খোদাবক্স। কোন মেয়েটি বিবাহিতা, আর কোনটি কুমারী। কোন মেয়েটির বাবা বড় চাকুরে আর কোনটির বাবা কেরানী। সব খবর রাখে খোদাবক্স। উৎসাহী খদ্দেরদের পরিবেশন করে সে। তাদের অতৃপ্ত আত্মাকে তৃপ্ত করে।

পত্রিকাটি মাটিতে পড়ে গিয়েছিলো। তুলে নিয়ে টেবিলের ওপর বিছিয়ে চারজন এক সঙ্গে ঝুঁকে পড়লো ওরা।



একটা প্রাইভেট ফার্মে পার্সোনাল এ্যাসিস্টেন্টের চাকরি।

মাসে দেড়শ টাকা বেতন।

খোদাবক্সের কাছ থেকে কাগজ-কলম নিয়ে, নাম-ঠিকানা টুকে নিল  
মাহমুদ।

খোদাবক্স একগাল হেসে বললো, কেমন বলি নি, খুব ভালো চাকরি?

মাহমুদ বললো, হবে না, শুধু শুধু কাগজ-কালি খরচ করা।

রফিক বললো, তবু দেখা যাক না একবার কপাল ঠুকে।

নঈম বড় রোগাটে, চেহারাখানাও তার বড় ভালো নয়, বললো, আমার  
মুখ দেখেই ব্যাটারা বিদায় করে দেবে।

খোদাবক্স বললো, সব খোদার ইচ্ছে, চারজন একসঙ্গে চেষ্টা করে দেখুন  
না-একজনের হয়েও যেতে পারে।

এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে মাহমুদ চুপচাপ পত্রিকার পাতা ওল্টাতে  
লাগলো। চা খাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ এখানে বসে থাকবে সে। এটা সেটা  
নিয়ে তর্ক করবে। আর মাঝে মাঝে একটু অন্যমনস্ক হয়ে ভাববে, আশা নামক  
প্রবৃত্তিটি কত দুর্দমনীয়। পুরো একটা বছর ‘মিলন’ পত্রিকার চাকরি করার পর  
আশার ক্ষীণ অস্তিত্বও লোপ পাওয়া উচিত ছিলো। তবু এখনো যে কেমন করে  
তার রেশ জেগে আছে মনে, ভেবে বিস্মিত হয় মাহমুদ। লুই ফিশার হওয়ার  
কল্পনায় যে-একদিন বিভোর ছিলো। সে আজ আর তেমনি স্বপ্ন দেখতে পারে  
না।

প্রাত্যহিক ঘটনার অভিজ্ঞতায় স্বপ্নগুলো ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে তার।

একদিনের কথা মনে পড়ে। সেদিন রাতে ডিউটি ছিলো তার। নিউজ  
সেকশনের লম্বা টেবিলটায় সকলে কর্মব্যস্ত। এ সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ  
খবরগুলি পৌঁছায় এসে। তাই কাজের ভিড় বেড়ে যায়। হাতের কাছে একটা  
ছোট সংবাদ নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো মাহমুদ। পঁচিশ বছরের একজন শিক্ষিত

যুবক বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। খবরটা কি ছাপতে দিবো? নিউজ এডিটরের দিকে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো মাহমুদ।

কাগজটা হাতে নিয়ে খবরটা পড়লেন নিউজ এডিটর। তারপর ওটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললেন, বাদ দিন, স্পেস নেই।

কেন স্পেস তো অনেক আছে! কথাটা হঠাৎ বলে ফেললো মাহমুদ।

সরোষ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে নিউজ এডিটর গম্ভীর গলায় বললেন, স্পেস আছে কি নেই সেটা আপনার জানবার কথা নয়।

তারপর নীরব হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায়। ছিলো না তার। এমনি ঘটনা প্রায়ই ঘটতো।

একদিন কোন একটা জনসভায় লোক সমাবেশ নিয়ে তর্ক বেধে গেলো স্টাফ রিপোর্টারের সঙ্গে।

রিপোর্টার বলছিলেন, সভায় পাঁচহাজারের বেশি লোক হয় নি। মাহমুদ বললো, মিথ্যে কথা। পঞ্চাশ হাজারের উপরে এসেছিলো লোক।

রিপোর্টার বললেন, আপনি চোখে বেশি দেখেন।

মাহমুদ বললো, আমি যদি বেশি দেখে থাকি আপনি তাহলে কম দেখেন।

কম দেখতে হয় বলেই দেখি। দুর্ঠোটে এক টুকরো হাসি ছড়িয়ে চুপ করে গেলেন স্টাফ রিপোর্টার।

সিনিয়র সাব-এডিটর আমজাদ হােসেন এতক্ষণ নীরবে ঝগড়া শুনছিলেন। ওদের। দুজনে থামলে একটা পান মুখে পুরে দিয়ে বললেন, মাহমুদ সাহেব এখনো একেবারে বাচ্চা রয়ে গেছেন আপনি। লোক যে কেমন করে বাড়ে আর কেমন করে কমে তার কিছুই বোঝেন না-বলে শব্দ করে এক প্রস্থ হেসে উঠলেন তিনি।

বয় এসে সামনে চা নামিয়ে রাখতে ভাবনায় ছেদ পড়লো।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে মাহমুদ বললো, তুমিও ঘাবড়িয়ে না খোদাবক্স, সামনের মাস থেকে দশ টাকা বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হবে আমার, তার থেকে কিছু কিছু করে এক বছরে সব পাওনা পরিশোধ করে দেবো তোমার। বুঝলে?

খোদাবক্স একমুখ হেসে বললো, তাই নাকি? বড় ভালো কথা, বড় ভালো কথা, শুনে বড় খুশি হলাম।

নঈম বললো, এর পরে আমাদের এক কাপ করে চা খাওয়ান উচিত তোমার মাহমুদ।

মাহমুদ নির্বিকার গলায় বললো, ‘খাও’ বলে বয়কে ওদের তিন কাপ চা দেবার জন্যে আদেশ করলো সে। খোদাবক্সকেও এক কাপ দিতে বললো। বয় চা নিয়ে এলে পর সামনে ঝুঁকে পড়ে মাহমুদ বললো, দশ টাকা যদি বাড়ে আমার, তাহলে রোজ একটা করে সিগারেট খাওয়াবো তোমাদের।

নঈম খুশি হয়ে বললো, আমার যদি এ চাকরিটা হয়ে যায়, তাহলে রোজ এক কাপ করে চা খাওয়াবো।

রফিক কিছু বললো না। ও একটু অন্যমনস্ক আজ।

তাহলে এ চাকরিটার জন্য তুমি দরখাস্ত করছাে? মাহমুদ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো।

হ্যাঁ। তুমিও করো। নঈম জবাব দিলো।

রফিক উঠে যাচ্ছিলো। নঈম চোঁচিয়ে উঠলো, ওকি যাচ্ছে কোথায়, বসো।

রফিক বললো, আর কতো বসবো? বোধ হয় আসবে না আজ।

মাহমুদ জিজ্ঞেস করবে ভাবছিলো, সে কে?

নঈম বললো, আরেকটু বসো, এই এসে পড়বে আজ বোধ হয় ঘোড়ার গাড়িটা কোথাও আটকে পড়েছে; কে জানে হয়তো রেলওয়ে ক্রসিং-এর ওখানে হবে।

মাহমুদ এতক্ষণে বুঝলো একটি মেয়ের অপেক্ষা করছে রফিক। ঘোড়ার গাড়িতে করে আসবে মেয়েটি। এখান থেকে রফিক দেখবে তাকে। শুধু চোখের দেখা।

মেয়ের কথা উঠতে খোদাবক্স বললো, আপনাকে কত করে বলেছিলাম মাহমুদ সাহেব, সেই মেয়েটার সঙ্গে বুলে পড়ুন, তাহলে কি আজকে আপনার এই অবস্থা হতো? এতদিনে হ্যাট-টাই পরে মোটর গাড়ি হাঁকতেন।

তার দিকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানলো মাহমুদ। কিছু বললো না। নঈম বললো, হ্যাঁ, তাইতো আজকাল যে মেয়েটিকে আর দেখি নে তো, বিয়ে হয়ে গেছে বুঝি?

খোদাবক্স মুখখান বিকৃত করে বললো, বিয়ে হয়ে যাবে না তো কী? ওরা হলো বড় লোকের মেয়ে, বড় মহার্য বস্তু। ও কি ফেলনা যে পড়ে থাকবে? কত ছেলে লাইন বেঁধে থাকে বিয়ে করার জন্য।

হয়েছেও তাই। এইতো গেলো মাসে মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে এক ইঞ্জিনিয়ারের সাথে। ছেলেটির বড় জোড় বরাত, বিয়ের কিছুদিন পরেই স্কলারশিপ বাগিয়ে আমেরিকায় চলে গেছে।

নঈম প্রশ্ন করলো, আর সে মেয়েটি?

মেয়েটিকে কি রেখে যাবে নাকি? খোদাবক্স জবাব দিলো, সঙ্গে করে নিয়ে গেছে আমেরিকায়।

পত্রিকার উপর ঝুঁকে পড়ে মাহমুদ একটা খবর পড়ায় মনোযোগী হবার চেষ্টা করলো কিন্তু কিছুতে মন বসাতেই পারলো না সে। কাগজটা মুড়ে রেখে অনেকটা বিরক্তির সাথে উঠে দাঁড়ালো সে। তারপর আকস্মিক ভাবে ‘চলি’ বলে বিশ্রামাগার থেকে বেরিয়ে এলো মাহমুদ। বেরুবার পথে সে শুনতে পেলো নঈম বলছে—আহা, যাবে আর কি, বসো না। ঘোড়ার গাড়িটা আসতে আজ বড় দেরি হচ্ছে, এসে পড়বে এক্ষুণি। বসো, আরেক কাপ চা খাও।

বুঝতে কষ্ট হলো না মাহমুদের, রফিককে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলছে  
নঈম।

বিশ্রামাগার থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে ভাবছিলো মাহমুদ, পেছনে কে  
যেন নাম ধরে ডাকলো। ফিরে তাকিয়ে দেখে শাহাদাত দাঁড়িয়ে।

পরনে একটা পায়জামা, গায়ে পাঞ্জাবি আর হাতে গুটিকয় বই।

কিহে, এখানে কোথায় এসেছিলে?

পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে মনটা ভালো হয়ে গেলো মাহমুদের।

শাহাদাত বললো, প্রেসের কিছু টাকা পাওনা ছিলো একজনের কাছে।  
দু-বছর আগের টাকা, হেঁটে হেঁটে সারা হলুম, আজ দেবো কাল দেবো করে  
ব্যাটা শুধু ঘুরাচ্ছে আমায়।

মাহমুদ গম্ভীর হয়ে বললো, বাকি দাও কেন?

শাহাদাত বললো, আগে কয়েকটা কাজ করিয়েছিলো তাই দিয়েছি।

হুঁ। মাহমুদ চুপ করে গেলো।

খানিকক্ষণ পর শাহাদাত আবার বললো, তুমি তো, আজকাল আর  
ওদিকে আসো না, আমেনা প্রায়ই তোমার কথা জিজ্ঞেস করে। আসো না  
একদিন।

মাহমুদ বললো, আসবো।

শাহাদাত শুধালো, কবে?

মাহমুদ বললো, সে দেখা যাবে পরে। এসো তোমাকে এক কাপ চা  
খাওয়াই।

পুরোনো বন্ধুকে সাথে নিয়ে আবার বিশ্রামাগারে ফিরে এলো মাহমুদ।

কোণের একখানা টেবিলে এসে দুজনে বসলো ওরা।

নঈম আর রফিক ঝুঁকে পড়ে নিজেদের মধ্যে কি যেন আলাপ করছে।  
খোদাবক্স কাউন্টার থেকে মুখ তুলে মাহমুদকে এবং বিশেষ করে শাহাদাতকে  
লক্ষ্য করলো, উৎসুক চোখে। নতুন খদ্দের। এর আগে কখনো দেখে নি তাকে।

এক কাপ চায়ের অর্ডার দিলো মাহমুদ।

শাহাদাত বললো, তুমি খাবে না?

না। এই একটু আগে এক কাপ খেয়ে বেরিয়েছি।

পকেট হাতড়ে বিড়ি আছে কিনা দেখলো মাহমুদ। বিড়ি নেই। মুখখানা  
গুমোট করে বসে রইলো সে।

শাহাদাত শুধালো, কি হয়েছে?

মাহমুদ বললো, না, কিছু না। চুপ করে কেন, কথা বলো, ছেলে-মেয়েরা  
সব কেমন আছে?

ওদের কথা আর বলে না, হতাশ গলায় বললো শাহাদাত, বড়টার পেটের  
অসুখ আর ছোটটা সর্দি-কাশিতে ভুগছে।

হুঁ। টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে হাতের তালুতে মুখ রাখলে মাহমুদ। বয় এসে  
সামনে চা নামিয়ে রাখতে বললো, নাও, চা খাও।

শাহাদাত নীরবে চা খেতে লাগলো।

মাহমুদ চুপচাপ।

পরদিন শঙ্কিত মন নিয়ে ছাত্রীর বাড়িতে এলেও একটা ব্যাপারে মরিয়ম  
নিশ্চিত হতে পারলো না। মনসুরের সঙ্গে অমন দুব্যবহার করা উচিত হয় নি।  
আজ যদি তার সঙ্গে দেখা হয়, এবং দেখা হবে তা জানতো, তাহলে তার ক্ষমা  
চাইবে সে। ক্ষমা যদি নাও চায়, তবু ভালোভাবে-ভদ্রভাবে কথা বলবে মনসুরের  
সঙ্গে। যতদিন তার কাছ থেকে কোন অশোভন প্রকাশ না পায় ততদিন সহজ  
সম্পর্ক বজায় রাখবে মরিয়ম।

বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেলিনা কি যেন করছিলো। ওকে আসতে দেখে মৃদু হেসে অভ্যর্থনা জানালো।

মরিয়ম বললো, আমার আজ একটু দেরি হয়ে গেছে সেলিনা।

সেলিনা বললো, আমি ভাবছিলাম আজ তুমি আসবে না আপা?

অহেতুক চমকে উঠলো মরিয়ম। সেলিনাকে কিছু বলে নি তো মনসুর?

পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললো, কেন বলতো?

সেলিনা নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে জবাব দিলো, রোজ ঠিক সময়টিতে আসো কিনা, তাই।

ওর কথায় অনেকটা আশ্বস্ত হলো মরিয়ম। কিন্তু মনসুরকে আজ না দেখে কিছুক্ষণের মধ্যে আবার একটা অস্বস্তি জেগে উঠলো ওর ভেতরে। পড়াতে বসে বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো মরিয়ম। বাইরের ঘরে কোন গলার আওয়াজ পেলেই কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করলো কার গলা। আর যখন বুঝলো এ মনসুরের নয় তখন হতাশ হলো সে।

সেলিনা পড়ার ফাঁকে হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলো, তোমার কি শরীরটা আজ ভালো নেই আপা?

মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো মরিয়মের। ইতস্তত করে বললো, কই নাতো। কেন আমায় দেখে কি অসুস্থ মনে হচ্ছে?

সেলিনা বললো, হ্যাঁ।

‘না। আমার কিছু হয়নি, তুমি পড়ো’। ছাত্রীকে বইয়ের প্রতি মনোযোগী হতে আদেশ করলো মরিয়ম। তারপর সে ভাবলো, না-এসবের কোন অর্থ হয় না। যা ঘটে গেছে তার জন্যে অনুতাপ কেন করবে মরিয়ম। অন্যায় সে কিছু করে নি। লোকটার যে কোন অসৎ উদ্দেশ্য নেই তার নিশ্চয়তা আছে? উদ্দেশ্য মহৎ হওয়ারও কোন কারণ খুঁজে পেলো না সে। যেভাবে রোজ রোজ পিছু নেয়

তাতে তার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ জাগাটা স্বাভাবিক। কিন্তু লোকটাকে নিয়ে এত মাথা ঘামাতেই বা শুরু করেছে কেন মরিয়ম?

পড়ানো শেষ করে সবে বিদায় নেবে এমন সময় মনসুরকে হঠাৎ দোরগোড়ায় দেখে প্রথমে অবাক হলো, পর মুহূর্তে ফ্যাকাশে এবং তারপর রক্তাভ হলো মরিয়ম।

মনসুর এগিয়ে এসে বললো, কি খবর, কেমন আছেন?

ওর গলার স্বরে কোন জড়তা নেই, গতকালের ঘটনার কোন রেশ নেই, শুনে ঈষৎ বিস্মিত হলো মরিয়ম। পরক্ষণে সে মৃদু হেসে বললো, ভালো, আপনি কেমন? এতটুকু কথায় এত উচ্ছাস প্রকাশ নিজের কাছেই ভালো লাগলো না মরিয়মের।

মনসুর একটুকাল সন্ধানী দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো। কণ্ঠস্বরটা ওর কাছেও বড় নতুন ঠেকছে আজ।

কয়েকটা নীরব মুহূর্ত।

কী যে হলো, বড় ভয় করতে লাগলো মরিয়মের। মুখ তুলে ওর দিকে তাকাতে সাহস হলো না। ‘চলি সেলিনা।’ এক নিঃশ্বাসে কথাটা বলে দ্রুত রাস্তায় বেরিয়ে এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো মরিয়ম।

কিছুদূর এসে একবার পেছনে ফিরে দেখলে সে।

না। আজ আসছে না। মনসুর।

প্রথমে কিছুটা স্বস্তি বোধ করলেও, খানিক পরে মরিয়মের মনে হতে লাগলো, বোধ হয়। লোকটা অসম্ভব হয়েছে। ওর ব্যবহারে তাই আজ এলো না এগিয়ে দিতে। মনটা খারাপ হয়ে গেলো মরিয়মের।

বাসায় ফিরতে একটা মিহি কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলো মরিয়ম।

খোকনকে সামনে পেয়ে উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে রে খোকন? কাঁদছে কে?



খোকনের চোখজোড়া ছলছল করছিলো। ভাঙ্গা গলায় বললো, ছোট আপাকে বাবা মেরেছে।

‘কেন?’ প্রশ্নটা খোকনকে করলেও, তার উত্তরের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো না মরিয়ম। অন্ধকার ঘরে পা দিতে হাসিনার কান্নাটা আরো জোরে শোনা গেলো। বিছানায় উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদছে সে, আবছা দেখা যাচ্ছে তাকে।

ওর গায়ের ওপর একখানা হাত রেখে মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলো মরিয়ম, কি হয়েছে হেসি?

এক ঝটিকায় ওর হাতখানা দূরে সরিয়ে দিলো হাসিনা।

খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে স্যান্ডেলটা চৌকির নিচে রেখে দিলো মরিয়ম। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ব্লাউজটা ধীরে ধীরে খুললো সে। বডিসটা খুলে রাখলো আলনার ওপরে। শাড়িটা পাল্টে নিলো। তারপর নিঃশব্দে মায়ের ঘরে এলো সে। কি হয়েছে মা, হাসিনা কাঁদছে কেন? বলে মায়ের দিকে চোখ পড়তে রীতিমত আত্ননাদ করে উঠল মরিয়ম, একি! কি হয়েছে মা? চওড়া চৌকিটার ওপর শুয়ে মা। মাথাটা আগাগোড়া ব্যাণ্ডেজ করা।

বাবা পাশে বসে মৃদু পাখা করছেন তাকে। হাসমত আলী হাতের ইশারায় মরিয়মকে জোরে কথা বলতে নিষেধ করলেন। সালেহা বিবি ঘুমোচ্ছেন এখন। তাকে জাগানো ঠিক হবে না।

একটু পরে বাবার কাছ থেকে সব জানতে পেলো মরিয়ম। কতদিন তিনি বারণ করেছেন। সকলকে, ছাদে দৌড়-ঝাঁপ না দিতে। পুরোনো বাড়ি নড়বড়ে ছাদ। কখন ভেঙ্গে পড়ে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। তবু রোজ ছাদে উঠে খেলবে হাসিনা। আজও বিকেল বেলা খেলছিলো সে। নিচে তোর মা বসে বসে চাল বাছছিলেন, বাইরে ওই কুয়োতলায় রাখা আছে গিয়ে দেখে আয় তুই।

পোয়াখানেক ওজনের একটা ইট, ছাদ থেকে খসে তার মাথার উপর এসে পড়লো। ঘরের কোণে আলো নিয়ে দেখ, কত রক্ত জমে আছে সেখানে।

হাসমত আলী থামলেন।

তিনি তখন বাসায় ছিলেন। আয়োডিন আনিয়ে ব্যাল্ডেজ করে দিয়েছেন সালেহা বিবির মাথায়। রাতের রান্না-বান্না কিছুই হয় নি। দুলুটা কাঁদতে কাঁদতে এই একটু আগে ঘুমিয়ে পড়েছে। খোকনটারও ক্ষিধে পেয়েছে নিশ্চয়। যদিও মুখ ফুটে সে কিছু বলে নি এখনো। হারিকেনের মৃদু আলোতে বসে বসে পড়ছে সে। মাঝে মাঝে উস্খুস করছে, চোখ তুলে তাকাচ্ছে ওদের দিকে।

হারিকেনের আগুনে কুপিটা ধরিয়ে নিয়ে পাকঘরে চলে গেলো মরিয়ম।

হাসিনার কান্নাটা এখান থেকে শোনা যাচ্ছে। রাগের মাথায় ভীষণ মেরেছেন তাকে বাবা।

একটা তরকারি আর দুটো ভাত সিদ্ধ করে নামাতে বেশ রাত হয়ে গেলো। ঘুম থেকে তুলে দুলুকে নিজ হাতে খাইয়ে দিলো মরিয়ম। খোকনকে খাওয়ালো। তারপর সবার জন্য ভাত সাজিয়ে হাসিনাকে ডাকতে এসে মরিয়ম দেখলো, কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে হাসিনা।

প্রথমে দূর থেকে ডাকলো মরিয়ম, তারপর ওর গায়ে হাত রেখে জোরে নাড়া দিয়ে বললো, হাসি উঠ, বাবা বসে আছেন তোমার জন্যে।

বড় ক্লান্তি লাগছিলো ওর। হাত ধরে টেনে বললো, কইরে ওঠ।

হাসিনা নড়েচড়ে আবার চুপ করে রইলো।

হাসি ভাত খাবি ওঠ।

আমি খাব না, হাসিনা জবাব দিলো তোমরা খাওগে যাও।

ওঠ মিছিমিছি রাগ করে না। নরম গলায় বললো মরিয়ম। তারপর দুহাতে ওকে বিছানা থেকে তোলার চেষ্টা করলো সে।

এই ভালো হবে না বলছি, এই-এই। ওর হাতে একটা কামড় বসিয়ে দিলো হাসিনা।

উহ! বলে ছেড়ে দিলো মরিয়ম। হাসিনা আবার চুপচাপ।

ওকে একা ফিরে আসতে দেখে হাসমত আলী শুধালেন, কী, হাসিনা এলো না?

মরিয়ম আশ্তে করে জবাব দিলো, ও খাবে না।

হাসমত আলী মাটির দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে কি যেন ভাবলেন, মুখখানা গভীর এবং বিরজ্জিপূর্ণ। একটু পরে নিজেকে শোনাচ্ছেন যেন এমনি করে বললেন, বয়স কি কম হয়েছে ওর? তবু একটু কাণ্ডজ্ঞান হলো না। বিয়ে হলে ও স্বামীর ঘর করবে কেমন করে?

মরিয়ম বললো, ভাত খাবে এসো বাবা।

হাসমত আলী বললো, তুমি খাওগে আমার ক্ষিধে নেই। স্ত্রীর পাশে বালিশটা টেনে কাৎ হয়ে শুলেন তিনি। মরিয়মকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবার বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, যাও, খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো, অনেক রাত হয়েছে।

আরো অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো মরিয়ম।

তারপর পাকঘরে গিয়ে ভাত-তরকারিগুলো চাপা দিয়ে দুগ্ধাস জল খেয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেলো। থাক, সেও খাবে না আজ।

হাসিনা ঘুমোচ্ছে। মৃদু নাক ডাকছে ওর।

বাইরের দরজাটা বন্ধ করা হয়েছে কিনা দেখে এসে শুয়ে পড়লো মরিয়ম।

শুধু এই বাড়িতে নয়, পুরো পাড়াটায় ঘুম নেবেছে এখন। দুএকটা বাড়ি থেকে অন্ধকার কাঁপিয়ে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে দুএকটা গলার স্বর। গলির হ্যাংলা কুকুরগুলো ডাকছে কখনো কখনো। আর কোন শব্দ নেই। কয়েকবার

ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। কিন্তু ঘুমোতে পারলেন না। হাসমত আলী। রাতে ঘুম না হওয়া বড় বেদনাদায়ক। বিশেষ করে এই নিরবতার মাঝখানে এক রাত জগতে গেলে, অনেক চিন্তা এসে জমাট বাঁধে মাথায়। একান্তভাবে কোন কিছু চিন্তা করার এটাই বোধ হয় প্রকৃত সময়।

অতীত। ভবিষ্যৎ। বর্তমান।

ছুরি দিয়ে কেটে-কেটে জীবনটাকে বিশ্লেষণ করার মত প্রবৃত্তি না হলেও, জীবনের ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তগুলো টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো স্মৃতি হয়ে দেখা দেয় মনে। সেখানে আনন্দ আছে, বিষাদ আছে। ব্যর্থতা আছে, সফলতা আছে, হাসি আছে, অশ্রু আছে। অতীতের মত বর্তমানও যেন ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত উঠা আর পড়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ভবিষ্যৎ কেমন হবে কেউ তা বলতে পারে না। তা-কি খুব সুন্দর হবে, না আরো মলিনতায় ভরা হবে ভাবতে ভাবতে একটুখানি তন্দ্রা এসেছিলো। একটা ধাড়ি হুঁদুরের কিচকিচি ডাকে তন্দ্রা ছুটে গেলো। তাঁর। চোখ মেলে চারপাশে তাকালেন হাসমত আলী। আবার চোখের পাতাজোড়া বন্ধ করলেন। তারপর ছেলেমেয়েদের কথা ভাবতে লাগলেন তিনি।

বড় ছেলে মাহমুদ। সবার বড় ও। কিন্তু ওর ওপর খুব বেশি নির্ভর করতে পারেন না তিনি। কি যে হবে ওর খোদা জানেন। লেখাপড়া শিখেছে। বছর তিনেক হলো বি. এ. পাশ করেছে। তার এই গ্রাজুয়েট হবার পেছনে নিজের কোন অবদান খুঁজে পান না হাসমত আলী। পত্রিকায় চাকরি করে নিজের টাকায় পড়েছে মাহমুদ। ম্যাট্রিক পাশ করার পর বাবার কাছে বেশি কিছু দাবি করে নি। দাবি করলেও দিতে পারতেন কিনা সন্দেহ। নিম্নপদস্থ কেরানীর পক্ষে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো শুধু কষ্টসাধ্য নয়, দুর্লভও বটে। তাই মাহমুদের নিজের ইচ্ছার ওপরে কোন রকম খবরদারী করার সাহস পান না। তিনি। জোর করে কিছু নির্দেশ দেবার পিতৃসূলভ ইচ্ছে থাকলেও তাকে দমন

করেন হাসমত আলী। নিজেকে অপরাধী মনে হয় ছেলের কাছে। মরিয়মের কাছেও অপরাধী হাসমত আলী।

ম্যাট্রিক পর্যন্ত ওর পড়ার খরচ জুগিয়েছেন তিনি, তারপর এ বাড়ি ও বাড়ি ছাত্রী পড়িয়ে কলেজে পড়েছে মরিয়ম। এই তো মাস দুয়েক হলো ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছে সে।

তারপর হাসিনা—

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েন। হাসমত আলী। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেন।

সেই যে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বাসা থেকে বেরিয়ে গেলো মাহমুদ তারপর দুদিন তার কোন দেখা নেই।

এমনি হয়।

মাঝে মাঝে বাসার সবার সঙ্গে ঝগড়া করে কয়েক দিনের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যায় মাহমুদ। বন্ধু-বান্ধবদের বাসায় গিয়ে থাকে। হাটেলে রেস্টোরাঁয় খায়। পকেটে পয়সা না থাকলে উপোসে কাটায়।

সকালে তখনও মাথার যন্ত্রণায় গায়ে জ্বর ছিলো সালেহা বিবির। মরিয়মকে ডেকে শুধোলেন তিনি, হ্যাঁরে, মাহমুদ ফিরেছে?

মায়ের পাশে এসে বসে মরিয়ম সংক্ষেপে বললো, না।

মা যন্ত্রণায় কাতর গলায় বললেন, কার যে স্বভাব পেলো ও। কিছু বলবার উপায় নেই, অমনি রাগ করবে। ওকে নিয়ে আমি কি করি বলতো? মায়ের দুচোখে জল।

মরিয়ম কিছু বলতে যাবার আগে হাসমত আলী উঃ গলায় বললেন, কি দরকার ছিলো ওকে রাগাবার। জানতো ও ওরকম, তবু ওসব কথা বলতে গেলে কেন।

খোকনের কাছ থেকে মাহমুদের বাড়ি না আসার কারণটা জানতে পেরেছিলেন তিনি। তখন থেকে স্ত্রীর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন হাসমত আলী। মাহমুদকে কোন কারণে রাগাবার পক্ষপাতী তিনি নন। স্বভাবে উদ্ধৃঞ্জলতা দােষ থাকলেও সে নিশ্চয় বখাটে ছেলে নয় তা বোঝেন হাসমত আলী। সংসারে টাকা-পয়সা দিয়ে প্রতিমাসে সাহায্য করছে সে। লেখাপড়া আর জানাশোনার দিক থেকেও বাবার চেয়ে সে অনেক বড়। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের সকলের ভবিষ্যৎ ওর হাতে নির্ভর করছে। নিজে যে কোন সময় মারা যেতে পারেন। সে জ্ঞান রাখেন হাসমত আলী। তখন মাহমুদ না থাকলে কে দেখবে ওদের? মরিয়ম-মেয়ে, ওর ওপর কতটুকু ভরসা করা যেতে পারে? দিন সব সময় এক রকম যায় না। মাহমুদ একদিন একটা ভালো চাকরি পেয়ে যেতে পারে সে আশাও রাখেন হাসমত আলী।

হাসমত আলীর কথার জবাবে উচ্চবাচ্য করলেন না সালেহা বিবি। নীরবে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। মরিয়ম উঠে যেতে যেতে বললো, তুমি এ নিয়ে বেশি ভেবো না মা। দুপুরে অফিসে গিয়ে ওর খোঁজ নেবো আমি।

হাসমত আলী অফিসে গেলে, মায়ের পাশে অনেকক্ষণ ঘোরাফেরা করলো হাসিনা। ইট পড়ে তার মাথা ফেটে গেছে। সেজন্য মনে মনে অনুতপ্ত সে।

সালেহা বিবির চোখে তন্দ্রা ছিলো, তাই প্রথমে নজরে আসে নি। পরে দৃষ্টি পড়তে ইশারায় তাকে কাছে ডাকলেন তিনি। ইতস্তত করে দূরে দাঁড়িয়ে রইলো হাসিনা।

সালেহা বিবি আবার ডাকলেন, এদিকে আয় হাসি।

এবারে গুটি গুটি পায়ে পাশে এলো হাসিনা। ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে মা বললেন, তোর মুখখানা এত শুকনো কেন রে?

মায়ের বুকে মুখ গুঁজে হঠাৎ কেঁদে উঠলো হাসিনা। মা, আর উঠবো না মা। আর ছাতে উঠবো না। সালেহা বিবি তার চুলে সিঁথি কেটে দিয়ে বললেন, ও মা, এতে কাঁদবার কী আছে। কাঁদে না মা। ছাতে যাবি না কেন, একশ বার যাবি।

হাসিনা তবুও বললো, না। আর যাবো না, মা।

আপাকে কাঁদতে দেখে, গালে আঙুল পুরে দুলু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিলো। ওর দিকে চোখ পড়তে সালেহা বললেন, দেখ হাসি, দুলুটা কেমন নোংরা হয়ে আছে। ওকে একটু কুয়োতলায় নিয়ে ভালো করে চান করিয়ে দে না মা।

অন্য সময় হলে ঠোঁট বাঁকিয়ে সেখান থেকে দূরে সরে যেতো হাসিনা। এখন গেলো না। মায়ের বুক থেকে মুখ তুলে একটু হাসলো। তারপর খুশি মনে দুলুকে কুয়োতে চান করাতে নিয়ে গেলো হাসিনা।

রাতে পত্রিকা অফিসে এসে দারওয়ানের হাতে একখানা চিঠি পেলো মাহমুদ।

দারওয়ান বললো, ‘এক মেমসােব দে গিয়া।’

চিঠিখানা খুলে পড়লো সে। মরিয়ম লিখেছে।

‘ভাইয়া,

আজ দুদিন তুমি বাসায় এলে না। মারা ভীষণ অসুখ। বারবার তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছেন। মাকে এভাবে কেন কষ্ট দিচ্ছে তুমি?

আশা করি আজ নিশ্চয় বাসায় ফিরবে।’

নিচে নিজের নাম সই করেছে।

চিঠিটা পড়ে টুকরো করে ছিড়ে ফেললো মাহমুদ। ‘মা ভীষণ অসুস্থ, ইয়াকির আর জায়গা পায়নি’ মনে মনে বললো মাহমুদ। এ শুধু ওকে বাসায় ফিরিয়ে নেবার চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। এভাবে একটা মিথ্যে কথার আশ্রয় না-নিয়ে সরাসরি বাসায় যাবার জন্যে লিখলেই তো পারতো মরিয়ম। মাহমুদ ভাবলো, রাতে বাসায় ফিরে মরিয়মকে এক প্রস্থ গালাগাল দিতে হবে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলে, সামনে একফালি সরু বারান্দা। ডান হাতে ম্যানেজারের দপ্তর। বাঁ হাতে নিউজ সেকসনের লম্বা ঘর। টেবিলের ওপর কাগজের স্তূপ। আলপিনের বাক্স। শূন্য চায়ের পেয়ালা। পেপার কাটার আর দোয়াত কলম। একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো মাহমুদ। প্রথম প্রথম এ ঘরটিতে এসে ঢুকতে আশ্চর্য রোমাঞ্চ অনুভব করতো সে। এখন কোন অনুভূতিই জাগে না। বরঞ্চ বিতৃষ্ণায় ভরে উঠে মন। সাংবাদিক হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে আজ সে লজ্জা বোধ করে। সে তো সাংবাদিক নয়, মালিকের হাতের একটি যন্ত্রবিশেষ। কর্তার ইচ্ছেমতো সংবাদ তৈরি করতে হয় তাকে। তাঁরই ইচ্ছেমত বিকৃত খবর পরিবেশন করতে হয়। মাঝে মাঝে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে মন। তখন সে ভাবে, যদি তার টাকা থাকতো তা হলে নিজে একখানা পত্রিকা বের করতো মাহমুদ। সুস্থ সাংবাদিকতা হতো যার আদর্শ। কিন্তু এসব উদ্ভট কল্পনা বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রত্যহ প্রয়োজন মেটানোর যার সামর্থ্য নেই, সে স্বপ্ন দেখে দৈনিক পত্রিকা বের করবার। ‘দুত্তোর আদর্শ’-পিনের বাক্সটা একপাশে ঠেলে রেখে, কলামটা হাতে তুলে নিলো মাহমুদ।

মাসখানেক পরে, একদিন সেলিনাকে পড়াতে আসার পথে দূর থেকে ওদের বাসার সামনে একটা চকলেট রঙের নতুন গাড়ি দেখতে পেলো মরিয়ম। ভাবলো, বোধ হয় নতুন কোন অতিথি এসেছে বাসায়।

এ একমাসে বৈচিত্র্যের দিক থেকে না হলেও, ঘটনার দিক থেকে অনেক নতুন কিছু ঘটেছে তার জীবনে। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছে সে। যে চাকরিটা



হবে আশা করেছিলো, তা হয়নি। আরো দু একটা নতুন টিউশনি পাবার আশ্বাস পেয়েছে মরিয়ম। মনসুরের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক বজায় রেখেছে সে। গত এক মাসের মেলামেশার মধ্য দিয়ে লোকটাকে কখনো খারাপ মনে হয় নি। অন্তত সে রকম কোন ধারণা জন্মাবার মত ব্যবহার করে নি মনসুর। যে ক’দিন এখানে এসেছে, যাবার পথে গলির মাথা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছে মরিয়মকে। একদিন তো সে নিজেই আমন্ত্রণ করেছিলো তাকে, আসুন না আমাদের বাসায়, একটু বসে যাবেন।

‘না, আজ থাক। আরেকদিন যাবো।’ উপেক্ষা নয়, বরং সলজ্জ সংকোচে আমন্ত্রণ এড়িয়ে গেছে মনসুর।

মরিয়ম তাতে দুঃখ পেয়েছে তা নয়। সে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করায়, নিজের দৈন্য আর প্রতিপক্ষের স্বচ্ছলতার কথা ভেবে অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছে মরিয়ম। যদি সে আসতো। তাহলে তাকে কোথায় বসতে দিতো মরিয়ম। কী খাওয়াতো তাকে?

যে কোনদিন মনসুর বাসায় যাওয়ার কথা তুলতে পারে এই আশঙ্কায় সুন্দর দেখে দুটো চায়ের কাপ দুটো পিরিচ কিনে রেখেছে সে বাসায়। এলে আর কিছু না হোক এক কাপ চা তো দিতে হবে। মরিয়ম আরো ভেবেছে, দুটো চায়ের আর একটা গোল টিপয় যদি কিনতে পারে তাহলে হয়তো ভদ্রভাবে সাজানো যাবে ঘরটাকে। বাইরে থেকে কেউ এলে তাকে বসানো যাবে।

দূর থেকে মটরটাকে দেখছিলো মরিয়ম, পাশ কাটিয়ে ভেতরে যাবার সময় আরেক বার চোখ বুলিয়ে নিলো সে।

বৈঠকখানায় সবার সাথে এক সঙ্গে দেখা। বাইরে বেরুবার তোড়জোড় করছিলো ওরা। সেলিনা, তার আন্মা আর মনসুর। সেলিনার বাবাকে দেখা গেলো না সেখানে। একটা ছাই রঙের প্যান্ট পরেছে মনসুর। গায়ে একটা সিল্কের সাদা সাঁট। সেলিনার পরনে আকাশ রঙের শাড়ি, গায়ে বাদামি ব্লাউজ।

ওকে দেখতে পেয়ে সেলিনা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো, এই যে আপা এসে গেছে, কি মজা, এবার সবাই একসঙ্গে বেড়াতে বেরুবো আমরা।

মনসুর হাসলো। সেলিনার আশ্বাস।

অপ্রস্তুত মরিয়ম তিনজনের দিকে তাকালো একবার করে। মনসুর হেসে বললো, আপনার অপেক্ষা করছিলাম আমরা। সেলিনা আজ পড়বে না। চলুন বেরিয়ে আসবেন আমাদের সঙ্গে।

সেলিনার আশ্বাস-আনিসা বেগমের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে মরিয়ম জানতে চাইলো, কোথায় যাচ্ছেন আপনারা?

সেলিনা আর আনিসা বেগম দুজনে এক সঙ্গে বলে উঠলো, নিউ মার্কেট। উপলক্ষটা তেমন কিছু নয় আসার পথে বাইরে যে গাড়িটা দেখে এসেছে মরিয়ম কিছুদিন হলো মনসুর কিনেছে ওটা। ওর নতুন গাড়িতে করে ওদের একটু ঘুরিয়ে আনতে চায় সে।

এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেও পারবে না মরিয়ম, তা জানতো সে। তাই রাজী হয়ে বললো, আমায় একটু তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরতে হয় আজ।

মনসুর বললো, ঘাবড়াবেন না। ঠিক সময়ে বাসায় পৌঁছে দেবো আপনাকে।

সেলিনা অহেতুক ফিক করে হাসলো একটু। আনিসা বেগম কেন যেন একটু গভীর হয়ে গেলেন।

গাড়িতে মনসুর আর সেলিনা সামনের সিটে বসলো। মরিয়ম আর আনিসা বেগম পেছনে।

হ্যাঁ, গত এক মাসে আরো একটি সত্য আবিষ্কার করেছে মরিয়ম। একদিন কথায় কথায় আনিসা বেগম হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেছিলেন তাকে মনসুরকে কেমন মনে হয় তোমার মরিয়ম?

এ ধরনের প্রশ্ন আশা করেনি মরিয়ম, তাই মুহূর্ত কয়েক বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলো। সহসা কোন জবাব দিতে পারে নি। ক্ষণকাল নীরব থেকে বলেছে, কেন, বেশ ভালোই তো।

আনিসা বেগমের মুখখানা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার উত্তর শুনে। আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে চাপা স্বরে বলেছেন, সেলিনার সঙ্গে ওকে কেমন মানাবে বলতো?

প্রশ্নের হেতুটা এতক্ষণে বুঝতে পেরে খানিকটা স্বস্তি পেয়েছে মরিয়ম।

কিন্তু এরকম কিছু মুহূর্ত আগেও ভাবে নি সে। পরন্তু অন্য একটি সম্ভাবনার কথা ভেবে শঙ্কিত হয়েছিলো। উত্তরটা দিতে আবার বিলম্ব হয়েছিলো মরিয়মের, মন্দ কি? বেশ ভালোই মানাবে ওদের।

আমারো তাই মনে হয়, আনিসা বেগম বলেছিলেন, কিন্তু কথাটা কোথাও আলোচনা করো না তুমি, কেমন?

মরিয়ম মাথা নত করে কথা দিয়েছিলো তাকে। না, এ কথা কাউকে জানাবে না সে।

গাড়িটা তখন নবাবপুর রোড ধরে এগুচ্ছিলো। দুধারে সারি সারি বাতিগুলো একে-একে পেছনে রেখে আসছিলো ওরা। বাইরে দৃষ্টি গলিয়ে দেখছিলো মরিয়ম। আঁচলে টান পড়তে মুখ ফিরিয়ে তাকালো সে। আনিসা বেগম কিছু বলতে চান তাকে। কাছে সরে আসতে ফিসফিসিয়ে তিনি বললেন, পাশাপাশি ওদের কেমন লাগছে বলতো?

শুনে হাসি পেলো মরিয়মের। অতি কষ্টে সামলে নিয়ে জবাব দিলো, বেশ ভালো।

আনিসা বেগম গলাটা আরো খাটো করে বললে, দুজনের গায়ের রঙ এক রকম, তাই না?

মরিয়ম বললো, হ্যাঁ।

স্বভাবের দিক থেকেও বেশ মিলবে, তাই না?

হ্যাঁ।

আনিসা বেগম মুখখানা ধীরে ধীরে সরিয়ে নিলেন বাইরের দিকে। রমনা এলাকাটা অনেকটা নির্জন। দুপাশে দোকানপাট, লোকজনের ভিড় নেই। কোলাহল নেই।

জানালার পাশে ঘেঁষে বসতে এক ঝলক বাতাস এসে সারা মুখখানা শীতল করে দিয়ে গেলো মরিয়মের।

নিউমার্কেট এসে অনেক কেনাকাটা করলো ওরা-সেলিনা আর আনিসা বেগম। দু-খানা শাড়ি কিনলো সেলিনা। একখানা ব্লাউজ পিস। এক টিন পাউডার, একটা টুথপেস্ট, কয়েকখানা সাবান কিনলো ওরা এ-দোকান সে-দোকান ঘুরে।

মনসুর একফাঁকে গলাটা নামিয়ে এনে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কিছু কিনবেন না? মরিয়ম অন্যমনস্কভাবে একটা সেন্টের শিশি নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে বললো, না।

কথাটা কানে গেলো আনিসা বেগমের। সেলিনাসহ একটা নকল পাথরের তৈরি মালার দর করছিলেন তিনি। ওর দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, ওকি, তুমি তো কিছুই কিনলে না, একটা-কিছু কেনা উচিত তোমার।

মরিয়ম নিষেধ করতে যাচ্ছিলো। এক জোড়া মালা কিনে একটা ওর দিকে এগিয়ে দিলেন আনিসা বেগম, লজ্জা করছে কেন, তুমিতো আমার মেয়ের মতো।

এ কথার পর মালাটা ফিরিয়ে দিতে পারলো না মরিয়ম। আনিসা বেগম হয়তো মনে আঘাত পাবেন।

মনসুর চুপচাপ কেনাকাটা দেখছিলো। ওদের। মাঝেমাঝে দু-একটা মন্তব্য করছিলো। পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে দু-শিশি সেন্ট কিনলো সে। একটা সেলিনার জন্যে আরেকটা মরিয়মের জন্যে। মরিয়মকে

সরাসরি দিতে হয়তো সাহস হচ্ছিলো না। সেলিনার হাতে তুলে দিয়ে বললো, আমার তরফ থেকে এ দুটো দিলাম তোমাদের। তারপর আনিসা বেগমের দিকে তাকিয়ে বললো, খালাম্মা, আপনাকে কি দেয়া যেতে পারে বলুন তো?

আনিসা বেগম হেসে বরলেন, না বাবা, আমাকে দিতে হবে না, আমি বুড়োমানুষ।

সেলিনা পরক্ষণে বললো, মাকে একটু চুল না-ওঠার তেল কিনে দিন, মাথার চুলগুলো উঠে যাচ্ছে ওঁর।

মেয়ের প্রতি কুপিত দৃষ্টি হানলেন আনিসা বেগম।

মরিয়মের মুখখানা অনেক আগেই কালো হয়ে গেছে।

মার্কেট থেকে বেরুবার পথে মাহমুদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। বোধ হয় কোন কাজে এসেছে সে, মরিয়ম ভাবলো। চোখে চোখ পড়তে মৃদু হাসলো সে। মাহমুদের কোন ভাবান্তর হলো না। বাকি সকলের দিকে একটি সন্ধানী দৃষ্টি হেনে, ওর খুব কাছে এগিয়ে এসে আশ্তে করে জিজ্ঞেস করলো, এরা কারা?

ওরা তখন সামনে এগিয়ে গেছে। মরিয়ম পেছনে পড়ে ছিলো। একবার ওদের দিকে আরেকবার মাহমুদের দিকে তাকিয়ে বললো, এসো না, ওদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই তোমার।

আমি আলাপ করতে চাইনে মরিয়ম। ওরা কারা, তাই জানতে চেয়েছি। মাহমুদ গম্ভীর গলায় জবাব দিলো।

মরিয়ম অপ্রস্তুত গলায় বললো, একজন আমার ছাত্রী সেলিনা, আরেকজন তার মা।

আর লোকটা কে?

সেলিনার বড় বোনের দেওর।

যাও, ওরা অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে।

মরিয়ম তাকিয়ে দেখলো গাড়িতে বসে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই।  
গাড়িতে উঠতে গিয়ে সে লক্ষ্য করলো মনসুরের মুখখানা কেমন ভার-ভার।

বালিশে উপর হয়ে পড়ছিলো হাসিনা। যান্মাসিক পরীক্ষা ঘনিয়ে এসেছে  
ওর। রোজ পাঠ্য বই নিয়ে বসে প্রথমে একবার, লেখাপড়ার সূচনা যারা  
করেছিলো তাদের একপ্রস্থ গালাগাল আর অভিশাপ দিয়ে নেয় হাসিনা, তারপর  
পড়তে শুরু করে।

বাসায় ফিরে এসে, শাড়িটা বদলে নিয়ে, ওর কাছে এসে মরিয়ম বললো,  
তোমার জন্যে আজ একটা জিনিস এনেছি হাসিনা।

কী, কী আপা? বই ফেলে উঠে বসলো হাসিনা।

মরিয়ম মৃদু হাসলো। তার আগে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে তোমায়।

কী প্রতিজ্ঞা? হাসিনা ব্যগ্র গলায় জিজ্ঞেস করলো।

মরিয়ম বললো, ভালো করে লেখাপড়া করবে।

অন্য সময় হলে এত বড় প্রতিজ্ঞায় রাজী হতো না হাসিনা। কিন্তু, কিছু-  
একটা পাবার লোভে বিনা দ্বিধায় রাজী হয়ে গেলো।

বললো, ঠিক পড়বো দেখো, এই গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি তোমার। কী  
এনেছো আমার জন্যে, দেখাও না আপা। আর বিলম্ব সহ্য হচ্ছিলো না হাসিনার।

টেবিলের ওপর থেকে পাথরের মালাটা এনে, হাসিনার হাতে গুঁজে দিলো  
মরিয়ম। চোখের সামনে মালাটা তুলে ধরে আনন্দে ফেটে পড়লো হাসিনা।  
আপাকে জড়িয়ে ধরে বললো, কী সুন্দর আপা, কী সুন্দর!

মরিয়ম বললো, দাও আমি গলায় পড়িয়ে দেই।

মালাটা গলায় পরিয়ে দিয়ে টেবিলের ওপর থেকে কোণা-ভাঙা আয়নাটা  
এনে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখলো হাসিনা। খুশিতে চোখমুখ উজ্জ্বল  
হয়ে উঠলো তার। আপার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললো, দাঁড়াও মাকে দেখিয়ে আসি,

কি সুন্দর লাগছে তাই না? নাচতে নাচতে মাকে মালাটা দেখাতে চলে গেলো।  
সে।

সেটের ছোট্ট শিশিটা টেবিলের ওপর রাখা ছিলো। হাসিনার চোখ পড়ে  
নি। ওর ওপর। তাহলে এতক্ষণে বাড়িটা মাথায় তুলতো। উঠে গিয়ে শিশিটা  
চৌকির তলায় রাখা ওর টিনের বাক্সটার মধ্যে যত্ন করে রেখে দিলো মরিয়ম।  
হাসিনাকে ওটা দেবে না সে।

পথে আসতে আকাশে মেঘ দেখে এসেছিলো, মনে হয়েছিলো যে কোন  
সময় বৃষ্টি নামতে পারে। এতক্ষণে বুঝি নামলো। প্রথমে কয়েক ঝলক দমকা  
বাতাস জানালার কবাট, ঘরের দেয়ালে বাধা পেয়ে করুণ বিলাপের মত শব্দ  
করলো। তারপর ঝিরঝির এবং অবশেষে ঝামাঝাম শব্দে বৃষ্টি নেমে এলো।  
উঠে গিয়ে জানালার কবাট জোড়া বন্ধ করে দিলো মরিয়ম। গলির আর সব  
বাড়িগুলোতেও জানালা বন্ধ করার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। বউ-ঝিদের হাঁক-  
ডাক।

আপা-আপা-ও ঘর থেকে হাসিনার ডাক শোনা গেলো।

মরিয়ম জবাব দিলো, আসছি।

সবেমাত্র রান্নাবান্না সেরে এসেছেন সালেহা বিবি। হাসমত আলী  
খোকনকে পড়াচ্ছেন বসে বসে। দুলুটা ওঁর পিঠের ওপর উপুড় হয়ে আছে গলা  
জড়িয়ে। মাকে মালাটা দেখাচ্ছিলো আর কি যেন বলছিলো হাসিনা। মরিয়ম  
অসতে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, এটা কত দিয়ে কিনেছিসরে আপা?

মরিয়ম বললো, বিনে পয়সায়।

মা, বাবা, হাসিনা তাকালো ওর দিকে।

মরিয়ম আবার বললো, সেলিনার আম্মা আমাকে কিনে দিয়েছে এটা।

ও। হাসিনা ঞ্চ কুঁচকে বললো, তাহলে তুই কিনিস নি!

সালেহা বিবি বললো, তোকে কিনে দিয়েছেন উনি, তুই আবার হাসিনাকে দিয়ে দিয়েছিস কেন?

মালা হারাবার ভয়ে হাসিনার মুখখানা ম্লান হয়ে গেলো।

মরিয়ম বললো, কী আছে, ও পরুক না।

শুনে আবার উজ্জ্বলতা ফিরে এলো হাসিনার চিবুকে।

বৃষ্টি তখন আরো বেড়েছে। বাইরে শুধু একটানা ঝুপঝাপ শব্দ। কে যেন জোরে কড়া নাড়ছে সদর দরজায়। সালেহা বিবি বললেন, দেখতে হাসিনা, বোধ হয় মাহমুদ এলো।

একটু পরে ছুটতে ছুটতে হাসিনা এসে হেসে লুটোপুটি খেলো-দেখে এসো মা, ভাইয়া একেবারে ভিজে চুপসে গেছে।

সালেহা বিবি ধমকালেন, দাঁত বের করে হাসছিস কেন, এতে হাসার কী আছে?

মরিয়মের মনে পড়লো মাহমুদের ঘরে আলো নেই। দ্রুত পায়ে নিজের ঘর থেকে হ্যারিকেনটা তুলে নিয়ে ওঘরে রাখলো সে। ভিজে কাপড়গুলো বদলে মাহমুদ তখন গামছায় পা মুছছিলো। কাগজের স্তুপের ওপাশে রাখা হ্যারিকেনটা নিয়ে ওতে আলো জেলে দিলো মরিয়ম।

কেমন করে ভিজলি, একটু কোথাও দাঁড়াতে পারলি না? মা এসে দাঁড়িয়েছেন দোরগোড়ায়।

মাহমুদ বললো, সখ করে নিশ্চয় ভিজি নি।

সালেহা বিবি বললেন, বছরের প্রথমে বৃষ্টি, এ বড় খারাপ। একটু গায়ে পড়লেই ঠাণ্ডা লেগে যায়। মাথার চুলগুলো মুছে নে ভালো করে।

মরিয়ম উঠতে যাচ্ছিলো। মাহমুদ বললো, কোথায় চললে, তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার, বসো।



মরিয়ম বসলো। ভেজা কাপড়গুলো নিয়ে সালেহা বিবি চলে গেলেন একটু পরে।

পকেট থেকে একটি বিড়ি বের করে ধারালো মাহমুদ। তারপর বিছানার মাঝখানে আস্তে করে বসলো, রোজ সন্ধ্যায় তুমি কোথায় যাও তা জানতে পারি কি আমি?

মরিয়ম অপ্রস্তুত হয়ে বললো, কেন ছাত্রী পড়াতে।

পড়ানোর কাজটা কি নিউমার্কেট সারা হয়? মাহমুদের গলায় শ্লেষ। মরিয়ম ক্ষণকাল নীরব থেকে বললো, ওরা নিউ মার্কেটে যাচ্ছিলো, সঙ্গে করে নিয়ে গেলো। আমায়-।

তুমি গেলে কেন-? ওর মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে মাহমুদ রুঢ় গলায় জবাব দিলো, ওদের সঙ্গে সম্পর্ক হলো মালিক আর মাস্টারনীর সম্পর্ক। ওদের মেয়েকে পড়াও আর বিনিময়ে টাকা পাও। নিউ মার্কেটে ওদের সঙ্গ দেবার জন্য নিশ্চয় কোন বাড়তি টাকা তোমাকে দেয়া হয় না?

মাথা নত করে চুপচাপ বসে রইলো মরিয়ম।

ওকে চুপ থাকতে দেখে হাতের বিড়িটা এক পাশে সজোড়ে ছুড়ে মেরে মাহমুদ আবার বললো, কতদিন বলেছি বড়লোকের বাচ্চাগুলোকে আমি দেখতে পারি না, আর তুমি সঙ্গে হাওয়া খেতে বেরোও?

ছেলের চিৎকার শুনে সালেহা বিবি ছুটে এসে প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে, অমন টেঁচাচ্ছিস কেন তুই?

হাসিনা এতক্ষণ দুয়ারের আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিলো সব। সে ফিসফিসিয়ে বললো, আপা সেলিনাদের সঙ্গে নিউ মার্কেটে গিয়েছিলো, তাই ভাইয়া বকছে তাকে।

সালেহা বিবি মাহমুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, নিউ মার্কেটে গেছে তাতে হয়েছে কি, এমন কি অন্যায় করেছে যে তুই বকছিস ওকে।

তুমি যা-বোঝো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না মা, কিছুটা সংযত হতে চেষ্টা করলো মাহমুদ। নিউ মার্কেট ও যাবে না কেন, একশো বার যাবে কিন্তু ওই বড়লোকদের বাচ্চাগুলোর সঙ্গে নয়।

কেন ওরা কি মানুষ না নাকি? সালেহা বিবি ছেলের অহেতুক রাগের কোন কারণ খুঁজে না-পেয়ে নিজেই রেগে গেলেন ওরা যদি সঙ্গে করে নিয়ে যায় তাহলে—

কই ওরা তো আমাকে নিয়ে যায় না? মায়ের মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে মাহমুদ জবাব দিলো। নিউ মার্কেট কেন সদরঘাট পর্যন্ত ওরা মোটরে করে নিয়ে যাবে না আমায়। তোমার মেয়েকে দেখবে বুড়িগঙ্গার ওপারেও নিয়ে যাবে। স্বরটা নামিয়ে নিয়ে মাহমুদ আবার বললো, কই দশ টাকা বেতন এ মাসে বাড়িয়ে দিবে বলে কথা দিয়েছিলো, বাড়িয়েছে? ওদের আমি চিনি নি ভাবছো? সব ব্যাটা বেঈমান।

মরিয়ম তখনো মাথা নুইয়ে চুপচাপ বসেছিলো। হারিকেনের আলোয় ভালো করে মুখ দেখা যাচ্ছিলো না ওর।

সালেহা বিবি ধীর গলায় বললেন, সব বড়লোক এক রকম হয় না।

যা জানো-না তা নিয়ে কথা বলো না। এত জোরে চিৎকার করে উঠলো মাহমুদ, যে ওরা সকলে চমকে তাকালো ওর দিকে। সব বড়লোক সমান না-কটা বড়লোক তুমি দেখেছো শুনি? কোনো বড়লোকের ছেলেকে দেখেছে। বি. এ. পাশ করে পঁচাত্তর টাকার চাকরির জন্যে মাথা খুঁড়ে মরতো? কই, একটা বড়লোক দেখাও তো আমায়, যার মেয়ে অন্যের বাড়িতে ছাত্রী পড়িয়ে যে টাকা পায় তা দিয়ে কলেজের বেতন শোধ করে? দুপুর রোদে এক মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে ক্লাশ করতে যায়? ওরা সমান না বললেই হলো। সব শালা বেঈমান, চামার। বিনে পয়সায় মানুষকে খাঁটিয়ে মারতে চায়। দিয়েছি। শালার চাকরি

ছেড়ে। জাহান্নামে যাক-বলতে গিয়ে কাশি এলো তার। বিছানার ওপর উপুড় হয়ে ভয়ানকভাবে কাশতে লাগলো মাহমুদ।

পাথরের মূর্তির মত ঠাঁয় দাঁড়িয়ে সালেহা বিবি।

মরিয়ম নীরব।

মাহমুদ তখনও কাশছে একটানা।

ওর কাছে এগিয়ে এসে শক্তিত গলায় সালেহা বিবি বললো, ঠাণ্ডা লাগে নি তো? একটু সরষের তেল গরম করে এনে বুকে মালিশ করে দেবো?

উঠে দাঁড়িয়ে বোধ হয় তেল গরম করে আনার জন্যে বেরিয়ে গেলো মরিয়ম।

কাশি থামলে মাহমুদ বললো, আমাকে নিয়ে অত চিন্তা করতে হবে না তোমাদের মা, এত সহজে আমি মরবো না। বলে লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো মাহমুদ।

সালেহা বিবি বললেন, শুয়ে পড়লি কেন? ওঠ। যাই আমি নামাজ পড়ে ভাত দেই তোদের।

হাসমত আলী পুরোপুরি ওর আলোচনাটা না-শুনতে পেলেও মাঝে মাঝে টুকরো কথাগুলো কানে আসছিলো তার। বিশেষ করে যখন নিজের দৈন্যের কথা, সাখীহীনতার কথা বলছিলো মাহমুদ। শুনেছিলেন আর মনে মনে নিজেকে বারবার অপরাধী বলে মনে হচ্ছিলো তাঁর। ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়া শেখানোর গুরুভার বহন করতে পারেন নি। তিনি। পারেন। নি তাদের সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়ে মানুষ করতে। তাদের শৈশব-যৌবনের আকাঙ্ক্ষাগুলোকে চরিতার্থ করতে। মনে মনে পীড়িত হচ্ছিলেন হাসমত আলী। স্ত্রীকে আসতে দেখে চাপা স্বরে শুধালেন, কি বলছিলো মাহমুদ।

সালেহা বিবি নামাজের যোগাড়যন্ত্র করতে করতে জবাব দিলেন, চাকরি ছেড়ে দিয়েছে ও।

অনেক কথা শুনলেও এ খবরটি ইতিপূর্বে কানে আসে নি তাঁর। স্ত্রীর মুখে শুনে, খানিকক্ষণ একটা অর্থহীন দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। ভ্রু-জোড়া ঈষৎ কুঁচকে এলো তাঁর। চোখজোড়া সরু হয়ে এলো। কেউ যেন শুনতে না পায় এমনি করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো হাসমত আলী।

বাইরে তখনো একটানা বৃষ্টি বুপবুপ শব্দে।

সালেহা বিবি সবে নামাজের নিয়ত বেঁধেছেন। হাসিনার উঁচু স্বরের ডাক শোনা গেলো ওঘর থেকে। আপা, জলদি আয়। পানি পড়ে বিছানাটা যে একেবারে ভিজে গেলো।

পাকঘরে বোধ হয় মাহমুদের জন্যে তেল গরম করতে এসেছিলো মরিয়ম। কান খাড়া করে ওর ডাক শুনতে পেলো সে।

একটু জোরে বৃষ্টি হলে ফাটল দিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা পানি পড়তে থাকে ঘরে। প্রতি বর্ষায় তাই বাড়িওয়ালাকে বলে মিস্ত্রী আনিয়ে ফাটলগুলো মেরামত করতে হয়। তা না হলে বর্ষার মরশুমে ঘরে থাকা দায় হয়ে পড়ে।

মরিয়ম এসে দেখলো টপটপ করে পানি পড়ে বিছানাটা বেশ ভিজে গেছে। দু-বোনে দু-মাথায় ধরে চৌকিটা একপাশে নিয়ে এলো। যেখানে পানি পড়ছিলো সেখানে একটা পানির পাত্র এনে বসিয়ে দিলো মরিয়ম। হাসিনা বললো, আজ রাতে থাকবে কেমন করে?

মরিয়ম কোনো জবাব দিলো না। চৌকির এক কোণে বসে পড়ে সে ভাবতে লাগলো কবে তাদের এমন দিন আসবে যখন এ বাড়ি ছেড়ে একটা ভালো বাসায় উঠে যেতে পারবে তারা, যেখানে ছাদটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে-ভেঙে পড়বে না মাথার উপর আর বৃষ্টির পানি তাদের চোখের ঘুম কেড়ে নেবে না? কিন্তু তেমন কোন দিন অদূর ভবিষ্যতে দেখতে পেলো না মরিয়ম। হাতজোড়া কোলের উপর গুটিয়ে রেখে অসহায়ভাবে বসে রইলো সে। মা যখন ভাত খেতে

ডাকলেন সকলকে, বৃষ্টি তখন থেমে আসছে। খাওয়া শেষ হতে অনেক রাত হয়ে গেলো।

বিছানায় শুয়ে বারবার এপাশ-ওপাশ করছিলেন হাসমত আলী।

সালেহা বিবি শুধালেন, কী ব্যাপার, অমন করছে কেন?

না, কিছু না। আবার পাশ ফিরে শুলেন হাসমত আলী।

কিছুক্ষণ পরে তার গলার আওয়াজ শোনা গেলো। মাহমুদ হঠাৎ চাকরিটা ছেড়ে দিলো কেন?

ওকে জিজ্ঞেস করলেই পারো। সালেহা বিবি উত্তর দিলেন, অত খামখেয়ালী হলে চলে? মাসে মাসে পঁচাত্তরটা টাকা কম ছিলো কিসে কণ্ঠস্বরে তার আক্ষেপ ধ্বনিত হলো।

হুঁ। আবার নড়েচড়ে শুলেন হাসমত আলী। তারপর মৃদু গলায় বললেন, ছেড়ে না দিলেই ভালো করতো।

একটু পরে নীরব হয়ে গেলেন দুজন।

সকালে ঘুম ভাঙতেই মরিয়মের মনে হলো, মাথাটা বড় বেশি ভার-ভার লাগছে ওর। গা-হাত-পা ব্যথা করছে। চোখের ভেতরটা জ্বলছে অল্প অল্প। হাত বাড়িয়ে হাসিনা আছে কিনা দেখলো মরিয়ম। ও উঠে গেছে, এতক্ষণে পাশের বাড়ির বউটিকে হয়তো গলার মালাটা দেখাতে গেছে সে। মরিয়ম পাশ ফিরে শুলো। একটু পরে আবার ঘুমিয়ে পড়লো সে।

ভালো করে আকাশটা ফর্সা হবার আগেই উঠে পড়েছিলো মাহমুদ, মুখ-হাত ধুয়ে চা নাস্তা খাবার আগে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লো সে। পরিচিত দুচার জনের বাসায় গিয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজের চাকরি ছেড়ে দেয়ার খবরটা জানালো, কোথাও কোন কাজের সুযোগ থাকলে যেন তাকে জানানো হয়-সে অনুরোধটাও তাদের করতে ভুললো না সে। বেশি টাকার আশা

করে না মাহমুদ, শ'খানেক টাকা পাওয়া যেতে পারে এ-রকমের একটা চাকরি পেলে আপাতত চলে যাবে তার।

এখানে-সেখানে ঘুরে বিশ্রামাগারের চৌকাঠে যখন পা রাখলে সে, তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে।

কেরোসিন কাঠের কাউন্টারের ওপাশে বসে হাতজোড়া সামনে প্রসারিত করে স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে নঙ্গমকে কি যেন বলছিলো খোদাবক্স। হ্যাঁ, নতুন আসছে মেয়েটা; এইতো হুগাকানেক হলো। একশ' টাকার মাস্টারনী-এই যে, মাহমুদ সাহেব যে, কাল কেমন ভিজলেন? কত করে বললাম, আরেকটু বসে যান, আকাশটা একটু ধরে আসুক। মাহমুদকে নীরব থাকতে দেখে খোদাবক্স তার পুরনো কথায় ফিরে গেলো। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। নতুন মাস্টারনী হয়েছে মেয়েটা। দেখতে কেমন বলছো? একেবারে আগুনের শিখা। গায়ের রংটা? কাঁচা হলুদ দেখছো কোনদিন? ঠিক তার মত। অনেক মেয়ে তো দেখলাম, অমনটি দেখি নি। একটা ঢোক গিয়ে খোদাবক্স আবার বললো, শরীরটা ছিপছিপে, চুলগুলো কোঁকড়ানো আর চোখ দুটো—।

দেখি আজকের খবরের কাগজটা এদিকে দাওতো।

মাহমুদের ডাকে কথার মাঝখানে হোঁচট খেলো খোদাবক্স। কাউন্টারের এককোণে রাখা খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে ওর দিকে ছুঁড়ে দিলো সে। তারপর আবার বললো, বসো না, চা খাও। একটু পরেই তো আসবে, দেখাবো তোমায়।

পত্রিকাটি খুলে চাকরির বিজ্ঞাপনের উপর চোখ বুলোতে লাগলো মাহমুদ। খোদাবক্সকে এখনো সে তার বেকারত্বের কথা শোনায় নি। তাহলে আর বাকিতে খেতে দেবে না। বলবে, এমনিতে এত টাকা জমা হয়ে আছে আপনার।

হ্যাঁ, মাহমুদ সাহেব ইয়ে হয়েছে, দশটা টাকা কি এ মাস থেকে বাড়লো আপনার? খোদাবক্স প্রশ্ন করছে।

পত্রিকা থেকে মুখ না-তুলে মাহমুদ জবাব দিলো, বাড়বে, এখনো বাড়েনি। মিথ্যে কথা বলে আশু আক্রমণ থেকে মুক্তি পেলেও মনে শান্তি পাচ্ছিলো না সে।

তা হলে এ মাসে কিছু টাকা শোধ করছেন আপনি? খোদাবক্সের গলা।  
তোমার কি হয়েছে বলতো। দিনে দিন একটা চামার হয়ে যাচ্ছে। সকালবেলা সবে এসেছি, অমনি টাকা-টাকা বলে চিৎকার শুরু করেছে? মাহমুদের গলা তিক্ততায় ভরা, টাকা শোধ করবো না বলে ভয় হচ্ছে নাকি তোমার? গরিব হতে পারি, নীচ নই, বুঝলে? যা খেয়েছি তা পাই-পাই করে শোধ করে দেবো। বেঈমান ভেবো না আমাদের, বেঈমান নাই। পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে রাস্তার পাশে পান-দোকানে বোলান দড়িটা থেকে আগুন ধরিয়ে এসে আবার বসলো মাহমুদ।

আপনি শুধু শুধু রাগ করছেন মাহমুদ সাহেব। আমি বলছিলাম। কি—।  
থাক, থাক, এবার চুপ করো। ওসব কথা শুনতে ভাল লাগে না আমার।  
বিড়িতে একটা জোর টান দিয়ে আবার পত্রিকার উপর ঝুঁকে পড়লো মাহমুদ।  
খদ্দেরদের রাগাতে মোটেই প্রস্তুত নয় খোদাবক্স। তাহলে ব্যবসার ক্ষতি হয়। বিশেষ করে ছোটখাটো রেস্টোরাঁ যারা চালায় তাদের পক্ষে এটা একটা অভিশাপস্বরূপ।

খানিকক্ষণ ইতস্তত করে গলাটা একবারে খাদে নামিয়ে খোদাবক্স বললো, আপনাদের সেই ইন্টারভিউটার কি হলো মাহমুদ সাহেব?

বিড়ির ছাই ফেলতে ফেলতে মাহমুদ জবাব দিলো, কিছু হয় নি- হবে না যে জানতাম। তার গলার স্বরটা শান্ত।

শুনে আশ্বস্ত হলো খোদাবক্স। একটা খদ্দেরের কাছ থেকে চা আর টোস্টের দামটা নিয়ে ক্যাশ বাক্সে রাখলে সে। তারপর সামনের রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইলো খোদাবক্স। রাতে বৃষ্টি হবার পর আজকের সকালটা

অন্য দিনের চেয়ে আরো বেশি উজ্জ্বল লাগছে। মেয়ে স্কুলের লাল দালানটার গায়ে চিকচিক করছে এক টুকরো রোদ। গেটের সামনে মেয়েদের বয়ে নিয়ে আসা ঘোড়ার গাড়িগুলো একটা দুটা করে জমা হচ্ছে এসে। এক সময়ে ক্ষুদ্র চোখজোড়া বড় হয়ে এলো খোদাবক্সের। ওই যে আসছে-আসছে। চাপা উত্তেজিত গলায় বললো সে। চোখজোড়া তখনো রাস্তার উপর নিবন্ধ তার।

ওর দৃষ্টি ধরে, মাহমুদ আর নঈম দু-জনে তাকালো সেদিকে।

খোদাবক্স মিথ্যে বলে নি। গায়ের রংটা ওর কাঁচা হলুদের মত। চুলগুলো ঘন কালো আর কোঁকড়ানো। দেহটা ছিপছিপে। সরু কটি। চোখজোড়া ভালো করে দেখতে পেলো না মাহমুদ। খোদাবক্স মৃদু হেসে বললো, এর কথা বলছিলাম, নতুন মাস্টারনী।

লাল দালানটার ভেতরে একটু পরেই অদৃশ্য হয়ে গেলো মেয়েটা। মাহমুদের মনে হলো কোথায় যেন তাকে দেখেছে সে। কোনো বাসায়? কোনো অফিসে? কোনো রাস্তার মোড়ে?

খোদাবক্স বললো, ওর নাম লিলি।

মাহমুদের মনে হলো, নামটাও এর আগে কোথায় শুনেছে সে। কার মুখে যেন শুনেছিলো? দূর তোর জাহান্নামে যাক মেয়েটা। দুহাতে মুখখানা ঢেকে নীরবে ভাবতে লাগলো মাহমুদ, কোথায় গেলে সে আশু একটা চাকরি পেতে পারে।

দুপুরের গানগনে রোদে চোখমুখ জ্বালা করছিলো ওর। আকাশে একটুও মেঘ নেই। রাস্তার পাশে একটি-দুটি পাতা ঝরা গাছ। ছায়াহীন পথ। মতিঝিলের চওড়া রাস্তাটা পেরিয়ে শান্তিনগরে প্রান্তিক প্রেসে যখন এসে পৌঁছলো মাহমুদ, তখন সূর্যের প্রখরতা এতটুকু কমে নি।

টিনের ছাপরা দেওয়া ছোট প্রেস।



ছাপরার নিচে একখানা চৌকোণ টেবিলকে সামনে নিয়ে, চেয়ারে বসে শাহাদত তালপাতার পাখায় হাওয়া দিচ্ছিলো গায়ে। ওকে দেখে পাখাটা সামনে নাবিয়ে রেখে ত্রস্তপায়ে উঠে দাঁড়ালো সে। আরে, মাহমুদ যে, এসো এসো।

মাহমুদ বললো, উতলা হয়ে না, বসো। কোণায় রাখা গোল টুলটা টেনে এনে বন্ধুর মুখোমুখি বসলো সে। তারপর একটা লম্বা হাই ছেড়ে জামার বুতামগুলো একে-একে সব খুলে নিলো। পাখাটা হাতে নিয়ে জোরে বাতাস করতে করতে শুধালো, তারপর কেমন আছে বলো।

কেমন আছি জিজ্ঞেস করছো? অদ্ভুতভাবে হাসলো শাহাদাত, সুখে আছি, দিনে দিনে তলিয়ে যাচ্ছি।

মাহমুদ বিরক্তির সাথে বললো, হেঁয়ালি রাখো, আমেনা কেমন আছে? শাহাদাত সংক্ষেপে বললো, ভালো।

ছেলেমেয়ে?

ভালো।

বাইরে গানগনে রোদের দিকে তাকিয়ে পাখাটা আরো জোরে নাড়তে লাগলো মাহমুদ। উপরের টিন তেতে গিয়ে গরমটা আরো বেশি করে লাগছে। এখানে।

হঠাৎ শাহাদাত শুধালো, তোমার কি খবর?

পাখা থামিয়ে মাহমুদ বললো, চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি।

ছেড়ে দিয়েছো? শাহাদাত অবাক হলো, এতদিনে পারলে ছাড়তে?

মাহমুদ বললো, ধৈর্যের একটা সীমা আছে বুঝলে? বলে চাকরি ছাড়ার ইতিবৃত্তটা ওকে শুনালা মাহমুদ। সাংবাদিক হবার স্বপ্ন ছিলো, সে তো চুরমার হয়ে গেছে। সাংবাদিকতার নামে গণিকাবৃত্তি করেছি এ-কবছর। মালিকের হুকুম তামিল করেছি বসে বসে। গেলকে ঘি বলতে বলেছে, বলেছি। হাতিকে খরগোশ

বানাতে বলেছে, বানিয়েছি। তবু বেটারা বেঈমামি করলো। জামার কলারটা তুলে ধরে জোরে বুকের মধ্যে বাতাস করতে লাগলো মাহমুদ।

কিছুক্ষণ পর শাহাদাত আবার প্রশ্ন করলো, এখন কি করবে তুমি?

সহসা কোন জবাব দিতে পারলো না মাহমুদ। কি ভেবে বললো, যে কোন একটা চাকরি পেলে করবো। তাইতো এসেছি তোমার কাছে। যদি কোথাও কোন প্রেসে কিছু-একটা জুটিয়ে দিতে পারো।

শাহাদাত বিব্রত গলায় বললো, আমার অবস্থা খুলে না বললেও তুমি বুঝতে পারো। কম্পিটিশনের বাজারে ভালো ক্যাপিটাল না-থাকলে বিজনেসে টিকে থাকা যায় না। প্রেসটা বোধ হয় বিক্রি করে দিতে হবে। ক্ষণকাল থেমে আবার বললো, থাকগে, নিজের দুঃখের কথা বলে তোমার দুঃখের বোঝা বাড়াতে চাই নে। আমার সাধ্যমত চেষ্টা করে দেখেবো, যদি কিছু জুটিয়ে দিতে পারি।

শেষের কথাগুলো মাহমুদের কানে গেলো কিনা বোঝা গেলো না। সামনে ঝুঁকে পড়ে অবাক কণ্ঠে সে শুধালো, প্রেসটা কি বিক্রি করে দেবে তুমি? শাহাদাতের প্রেস বিক্রি করে দেবার খবরে যেন ভীষণ আঘাত পেয়েছে সে।

শাহাদাত ম্লান হেসে বললো, কিছু টাকা। যদি দিতে পারো তা হলে এ যাত্রা ঠেক দিয়ে রাখা যায়। টাইপগুলো সব পুরনো হয়ে গেছে। ওগুলো দিয়ে আর কাজ চালানো যাচ্ছে না। নতুন টাইপ না কিনলে লোকে এখানে ছাপতে আসবে কেন? তাছাড়া শহরে এখন অনেক অভিজাত ছাপাখানা হয়ে গেছে—তাদের পাশে আমার টিনের ছাপরাটা কি হাস্যকর নয়? কথা শেষে আবার হাসলো শাহাদাত।

মাহমুদ এতক্ষণে গম্ভীর হয়ে গেছে। মাস কয়েক আগে বউয়ের অলংকার বিক্রি করে টাইপ কেনার টাকা সংগ্রহ করেছিলো শাহাদাত। সে-খবর মাহমুদের অজানা নয়। সে-টাকা তবে কি করেছে সে? জুয়ের আড্ডায় সব উড়িয়েছো বুঝি?

শাহাদাত চমকে বললো, কী?

আমেনার অলংকার বেচার টাকাগুলো?

শুনে বিমর্ষ হলো শাহাদাত। ইতস্তত করে বললো, পাগল হয়েছে?  
জুয়ের আড্ডায় উড়ানো, পাগল হয়েছে?

থাক, আমি তোমার কাছে কৈফিয়ত চাই নি, পাখাটা টেবিলের উপর  
নাবিয়ে রেখে মাহমুদ বললো, আমেনা আছে কি ভিতরে?

প্রসঙ্গটা আপনা থেকে ঘুরিয়ে নেয়ায় খুশি হলো শাহাদাত। বললো না,  
ও ওর এক খালার বাড়ি গেছে, এইতো কমলাপুর। বসো, এক্ষুণি এসে যাবে।

মাহমুদ বললো, না, আমি আর বসবো না। বেলা অনেক হয়ে গেছে,  
এবার উঠি।

শাহাদাত বললো, কোথায় যাবে?

বাসায়।

আরেকটু বসো না, এক কাপ চা খেয়ে যাও।

না, এখন চা খাবো না।

আবার সেই গানগনে রোদের সমুদ্রে নেমে এলো মাহমুদ। পেছন থেকে  
শাহাদাতের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আবার এসো কিন্তু।

সেই যে সকালে মাথা ধরেছিলো মরিয়মের তারপর দুটো দিন বিছানা  
ছেড়ে আর উঠতে পারলো না সে। সারা গা কঁপিয়ে জ্বর এলো। সারা দেহে  
অসহ্য যন্ত্রণা।

এখনো গায়ে জ্বর আছে অল্প-অল্প। ডাক্তারের কাছ থেকে মিকচার এনে  
খাইয়েছেন হাসমত আলী। মাথার পাশে বসে কপালে জলপট्टি দিয়েছেন সালেহা  
বিবি, হাসিনা গা-হাত পা টিপে দিয়েছে ওর।

শরীরটা ভয়ানক দুর্বল বোধ হলেও এখন অনেকটা সুস্থ মরিয়ম।

জানালা গলিয়ে এক ঝলক রোদ এসে পড়েছে। ঘরের কোণে, যেখানে একটা মাকড়সা জাল বুনছে আপন মনে। সুরকি-ঝরা লাল দেয়ালটা জুড়ে সাদা পাতলা আলোর জাল। চোখের পাতাজোড়া বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে রইলো মরিয়ম। সালেহা বিবি কখন এ ঘরে এসেছেন। টের পায় নি সে। কপালে একখানা হাত রেখে দেহের উত্তাপ নিলেন তিনি। তারপর মৃদুস্বরে বললেন এক বাটি বার্লি বানিয়ে দিই, কেমন?

মায়ের হাতের ওপর ওর ডান হাতখানা রেখে অস্পষ্ট স্বরে মরিয়ম বললো, খেতে ইচ্ছে করে না মা।

না খেলে যে শরীর আরো দুর্বল হয়ে পড়বে। সালেহা বিবির কণ্ঠে কোমলতায় ভরা, বানিয়ে আনবো।

আনো মা! ক্ষীণ গলায় জবাব দিলো মরিয়ম।

একটু পরে ওর গায়ের কাপড়টা ভালোভাবে টেনে দিয়ে চলে গেলেন মা। তার পায়ের লঘু শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো দূরে।

কোথায় একটা কাক ডাকছে কা কা করে। এই মাত্র একটি চিল ডেকে গেলো। গলিতে বুঝি কোন ছেলে টিন পিটিয়ে খেলা করছে। কারা কথা বলছে ও বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সব শুনছিলো মরিয়ম।

আপা! দোরগোড়ায় হাসিনার গলা, একটা লোক আসছে তোরা কাছে, দেখা করতে চায়।

জ্বরের মধ্যেও চমকে উঠলো মরিয়ম।

হাসিনা কাছে এসে বললো, ভেতরে নিয়ে আসবো?

হাতের ইশারায় ওকে আরো কাছে ডেকে মরিয়ম শুধালো, নাম জিজ্ঞেস করেছিস লোকটার।

হাসিনা মাথা নাড়লো, না তারপর নাম জিঞ্জেস করার জন্য বোধ হয়।  
আবার ফিরে যাচ্ছিলো হাসিনা।

মরিয়ম ক্ষীণ গলায় ডাকলো, হাসিনা এই শোন!

হাসিনা ফিরে দাঁড়ালো।

মরিয়ম বললো, মায়ের ঘর থেকে চেয়ারটা এনে এখানে রাখ। টেবিলের  
উপরে বইগুলো বড্ড আগোছালো হয়ে আছে। হ্যাঁরে হাসিনা, বাবা আছেন ঘরে?

হাসিনা ঘাড় নাড়ালো, না।

ভাইয়া?

না।

ইশারায় লোকটাকে ভেতরে নিয়ে আসতে বলে কাঁথাটা সারা গায়ে ভালো  
করে জড়িয়ে নিলো মরিয়ম।

প্রথমে মায়ের ঘর থেকে চেয়ারটা এ ঘরে রেখে গেলো হাসিনা। তারপর  
লোকটাকে নিয়ে এলো।

মরিয়ম যা আশঙ্কা করেছিল- মনসুর।

এ কী? ঘরে ঢুকে ওর চোখ পড়তেই দাঁড়িয়ে পড়লো মনসুর। আপনার  
অসুখ করেছে নাকি? ওর কণ্ঠস্বরের এই ব্যগ্রতায় বিব্রত বোধ করলো মরিয়ম।  
দৃষ্টিটা ওর পায়ের পাতার কাছে নামিয়ে এনে আশ্তে করে বললো, বসুন।

মনসুর বসলো।

হাসিনা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিলো। মাকে একটা নতুন লোক আসার  
খবর দেবার জন্য বোধ হয় চলে গেলো সে।

মরিয়ম তাকালো ওর দিকে।

একজোড়া গভীর সহানুভূতি ভরা চোখ চেয়ে দেখছে তাকে।

মরিয়ম বললো, তারপর কেমন আছেন?

ওর প্রশ্ন, খুশির আবির্ভাব ছড়িয়ে দিলো মনসুরের চোখেমুখে। ডান হাতের তর্জনী দিয়ে বাঁ হাতের তালুটা ঘষতে ঘষতে সে জবাব দিলো, আমি ভালো আছি। আপনার অসুখ হয়েছে জানতে পেলে আরো আগে দেখতে আসতাম। দু-দিন ও-বাসায় আপনি গেলেন না, ভাবলাম কিছু একটা নিশ্চয় হয়েছে। মনসুর থামলো। শান্ত, স্নিগ্ধ ও গভীর দৃষ্টি নিয়ে সে তাকালো মরিয়মের দিকে।

মরিয়ম ইতস্তত করে বললো, এখন জ্বর প্রায় ছেড়ে গেছে। দু-একদিনের মধ্যে ভালো হয়ে যাবো।

মনসুর বললো, দু-দিনের জুরে আপনি ভীষণ শুকিয়ে গেছেন।

রোগপাণ্ডুর মুখখানা ঈষৎ আরক্ত হলো মরিয়মের। ইচ্ছে হচ্ছিলো, গায়ের কাঁথাটা দিয়ে মুখটা ঢেকে ফেলতে তার। হাসিনা এসে এই বিপর্যন্ত অবস্থা থেকে মুক্তি দিলো তাকে।

মরিয়ম বললো, ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছে আপনার? আমার ছোট বোন হাসিনা।

মনসুর ফিরে তাকালো ওর দিকে। মৃদু হাসলো, তারপর বললো, উনিই তো ভেতরে এনেছেন আমায়।

হাসিনা চুপচাপ হাতের নখ খুঁটতে লাগলো। মরিয়ম দেখলো, মা দূর থেকে উঁকি মেরে একবার মনসুরকে দেখে চলে গেলেন। হাসিনাও গেলো তাঁর পিছু পিছু। শায়িত অবস্থায়, ওর দিকে তাকিয়েও মরিয়ম বুঝতে পারছিলো, একজোড়া সহানুভূতিভরা শান্ত চোখ গভীর দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে তাকে। অকারণে আরেক বার আরক্ত হলো মরিয়ম। কিছু না বলে নীরব থাকাটাও অস্বস্তিকর মনে হলো। অথচ কি যে আলোচনা করা যেতে পারে কিছু খুঁজে পেলো না। ‘হ্যাঁ, সেলিনা কেমন আছে?’ একটা কিছু আলোচনার বিষয়বস্তু পেয়ে আসন্ন বিপদমুক্ত হলো মরিয়ম।

মনসুর বললো, ভালো।

তারপর আবার নীরবতা।

এবার উঠি তাহলে। নীরবতা গুঁড়িয়ে বললো মনসুর, একটা কাজ আছে যাই এখন। আবার আসবো।

না না, যাবেন আর কি, আরেকটু বসুন, ক্ষীণ গলায় বললো মরিয়ম। দরজা লক্ষ্য করে তাকালো সে-যদি হাসিনাকে দেখা যায়। মনসুরকে চা-নাস্তা করানো উচিত এবং মা নিশ্চয়ই তার যোগাড়যন্ত্র করছে।

মরিয়মের অনুমান মিথ্যে নয়। একটু পরে, কিছুদিন আগে কেনা চায়ের কাপে চা আর একটা পিরিচে দুটো পাস্তুরা আর দুটো সন্দেশ সাজিয়ে নিয়ে এলো হাসিনা। টেবিলের উপর ওগুলো নামিয়ে রাখলে সে।

মরিয়ম বললো, এক গ্রাস পানি দিয়ে যাও হাসি।

মনসুর একবার টেবিলের দিকে, আরেকবার মরিয়মের দিকে তাকিয়ে নীরব রইলো।

মরিয়ম ওর দিকে কাৎ হয়ে শুয়ে বললো, আমরা গরীব। বিশেষ কিছু খাওয়াতে পারবো না আপনাকে,-এক কাপ চা খান। বলতে গিয়ে আবার আরক্ত হলো মরিয়ম। কিন্তু মনসুর গম্ভীর হয়ে গেছে, মুখখানা কালো হয়ে আসছে তার। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে এসেছে।

চা-নাস্তা খেয়ে আবার আসবো বলে চলে গেলো মনসুর।

ও চলে গেলে অনেকক্ষণ কেন যেন ভালো লাগলো মরিয়মের। সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর যে ক্লান্তি বোধ করছিলো তা আর এখন নেই। বাইরে কোন পরিবর্তন হয় নি। গায়ে জ্বর এখনো আছে, মাথাটা ধরে আছে এখনো। তবু একটা আনন্দের আভা জেগে উঠেছে তার দুগালে। বেশ সুস্থ মনে হচ্ছে নিজেকে। গায়ের উপর থেকে কথাটা সরিয়ে দিয়ে, চোখ বুজে মনসুরের কথা ভাবতে লাগলো মরিয়ম।

কে এসে ছিলোরে মরিয়ম? মায়ের কণ্ঠস্বর। হাতে এক গ্রাস বার্লি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

মরিয়ম বললো, সেলিনার বড় বোনের দেবর। বার্লির গ্লাসটার জন্য হাত বাড়িয়ে জবাব দিলো মরিয়ম। সে ভেবেছিলো, মা কিছু বলবেন, কিন্তু সালেহা বিবি আর কোন প্রশ্ন করলেন না। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মরিয়ম বুঝতে পারলো সালেহা বিবি লোকটার আগমনে সুখী হতে পারেন নি। কে জানে, হয়তো জাহেদের কথা মনে পড়ে গেছে তাঁর। কিন্তু সব পুরুষ কি এক রকম? বার্লির গ্লাস হাতে ভাবলো মরিয়ম। মনসুরকে জাহেদের মত বলে ভাবতে কোথায় যেন একটা যন্ত্রণা অনুভব করলো সে।

লোকটা করে কী? এতক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন সালেহা বিবি।

বার্লিটা খেয়ে নিয়ে মরিয়ম জবাব দিলো, ব্যবসা করে।

কিসের ব্যবসা?

জানি না।

মা চলে গেলে অনেকক্ষণ মরিয়ম ভাবলো, মনসুরকে বলে দিলেই হতো সে যেন আর না আসে।

বিকেলে আবার এলো মনসুর।

এক বোতল হরলিক্স আর এক ঠোঙ্গা আগুর-বেদানা হাতে। সসঙ্কোচে ওগুলো টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলে সে। মরিয়মের দিকে সরাসরি তাকাতে সাহস পেলো না।

মরিয়ম অস্ফুটস্বরে বললো, ওখানে কী?

মনসুর সলজ্জ গলায় বললো, একটা হরলিক্স আর কিছু ফুটস।

কেন এনেছেন শুধুশুধু। আর বেশি বলতে পারলো না মরিয়ম। মনে-মনে ওর প্রতি ভীষণ রাগ হচ্ছিলো তার। কিন্তু তা প্রকাশ করতে পারলো না।



একজোড়া সহানুভূতিপূর্ণ লজ্জাবনত চোখের দিকে তাকিয়ে সব ভুলে গেলো সে।  
সকালে এনে-রাখা চেয়ারখানা দেখিয়ে বললো, বসুন।

বাসায় বাবা আর মাহমুদ দু-জন আছেন এখন। তাদের কথা ভেবে  
শঙ্কিত হলো মরিয়ম। তারা নিশ্চয় মনসুরের এই আসা-যাওয়া শুভ চোখে দেখবে  
না। জাহেদকে এত সহজে ভুলতে পারে না। ওরা। মরিয়মও ভুলে নি।

এখন কেমন আছেন? গলার স্বরে উৎকর্ষ। কনুই-এর উপর ভর দিয়ে  
উঠে বসতে চেষ্টা করলো মরিয়ম। ক্ষীণ গলায় বললো, ভালো।

মনসুরকে এখন বিদায় দিতে পারলে বাঁচে সে। রোগাক্লিষ্ট দেহে কোন  
রকমে অপঘাত সহ্য করতে পারবে না। বাবা মনে-মনে রাগ করলেও মুখে কিছু  
বলবে না। কিন্তু মাহমুদ হয়তো প্রকাশ্যে অপমান করে বসবে। আর তা খুব  
সুখপ্রদ হবে না মরিয়মের কাছে।

কেমন আছিস মা? বাবা এখন আসবেন তা জানতো মরিয়ম। মুহূর্তে  
সারা গাল রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেলো তার। হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে এসে যেন  
শ্বাসরোধ করে দাঁড়ালো।

মনসুরকে দেখে বিব্রত বোধ করলেন হাসমত আলী।

মরিয়ম অস্ফুটস্বরে বললো, বাবা।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, ওদের দুজনকে চমকে দিয়ে হাসমত আলীর  
পা ধরে সালাম করলো মনসুর। ডানহাতখানা সামনে বাড়িয়ে ইতস্তত করে  
হাসমত আলী বললেন, থাক।

নিজের নাম আর পরিচয় শেষে শূন্য চেয়ারটা হাসমত আলীর দিকে  
বাড়িয়ে দিয়ে মনসুর বললো, বসুন। যেন ঐ বাড়ির কর্তা। হাসমত আলী মেহমান  
হিসেবে এসেছেন।

মনসুরের ব্যবহারে দুজনে ওরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে গেলো।

হাসমত আলী বললো, না, না, আমি বসব না, আপনি বসুন।

মনসুর বসলো না-দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর অত্যন্ত সহজভাবে হাসমত আলীর সঙ্গে মরিয়মের চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করলো সে। একটা ভালো ডাক্তার দেখানো উচিত। কিছু টনিক খাওয়ালে শারীরিক দুর্বলতা আর থাকবে না, তাও বললো মনসুর। বিব্রত বোধ করলেও অপ্রসন্ন যে হন নি হাসমত আলী, সেটা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো মরিয়ম। একটু আগের সকল শঙ্কা দূর হয়ে গিয়ে হাঙ্কা বোধ করলো সে।

পরদিন আবার এলো মনসুর।

পরদিন।

তার পরদিনও।

তারপর থেকে নিয়মিত ওদের বাসায় আসতে লাগলো মনসুর। বাবা, হাসিনা, সালেহা বিবি, খোকন, সকলকে কি এক অদ্ভুত যাদুবলে আপনার করে নিল সে। মরিয়ম নিজেও বুঝতে পারলো না, কেমন করে এটা সম্ভব হলো। স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের মত সমস্ত পরিবারকে দুর্বীর বেগে তার কাছে টেনে নিয়ে এলো মনসুর। হাসমত আলীকে বাবা বলে সম্বোধন করলো সে, সালেহা বিবিকে মা। খোকনকে একটা ফুটবল কিনে দিলো, দুলুকে একটা প্লাস্টিকের পুতুল। হাসিনার জন্য ওর পছন্দ মত একটা শাড়ি কিনে আনলো-আর মরিয়মের জন্য নানা রকম টনিক, ফ্রুটস আর হরলিক্স।

দারিদ্র্য-বিক্ষস্ত পরিবারে খোদার ফেরেস্তা হিসেবে আবির্ভূত হলো মনসুর। কোনদিন ও না এলে মা চিন্তিত হয়ে শুধায়, কিরে, মনসুরটা তো আজ এলো না। অসুখ-টসুখ করে নি তো ওর?

বাবা বলেন, আসবে, বোধহয় কোন কাজে-টাঁজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আহা বড় ভালো ছেলে। জীবনে কত মানুষ দেখলাম, এমন নম্র আর ভদ্র ছেলে আমি দেখি নি।

খোকন ফুটবলটা দুহাতে বুক জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন করে, মনসুর ভাই আজ আসবে না আপা?

হাসিনা বলে, সত্যি, উনি না এলে কিছু ভালো লাগে না।

কোনো মন্তব্য করে না, শুধু একজন। সে মাহমুদ। ভোরে ঘুম থেকে উঠে নির্বিকার নির্লিপ্ততায় বাইরে বেরিয়ে যায় সে। সারাদিন আর ফেরে না। ফেরে রাত বারোটায়। কোনদিন খায়, কোনদিন না-খেয়ে শুয়ে থাকে। বাসায় কাউকে মুখ দেখাতে যেন লজ্জা বোধ করে সে। তাই সকলের ঘুম ভেঙ্গে ওঠার আগে বেরিয়ে যায়-আবার সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তবে বাসায় ফেরে।

মনসুর দু-একদিন জিঙেস করছিলো ওর কথা।

সালেহা বিবি হতাশ গলায় বলেছেন, ওর কথা আর বলো কেন বাবা? বাসায় খোঁজ খবর কি রাখে ও? সারাটা দিন কি চিন্তায় যে ঘুরে বেড়ায়, খোদা জানে।

হাসিনা বলে, ভাইয়া দিন দিন বাউগুলে হয়ে যাচ্ছে।

হাসিনা! মরিয়ম শাসানো-দৃষ্টিতে তাকায় ওর দিকে।

হাসিনা বলে, বাউগুলে নয় তো কি? ভাইবোনগুলোর একটু খোঁজখবর নেয় কোনোদিন?

মরিয়ম বলে, ও কথা বলতে নেই হাসিনা।

হাসিনা চুপ করে যায়।

মরিয়ম এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। বিছানা ছেড়ে এ ঘরে ও ঘরে চলাফেরা করে সে। বাইরে বেরুতে চেয়েছিলো। কিন্তু মনসুরের কড়া নিষেধ। জ্বর ছাড়লে কি হবে, আবার আসতে পারে। শরীরটা সম্পূর্ণ সুস্থ না হলে বাইরে বেরুনো চলবে না।

মরিয়ম বলে, এখন তো কোন অসুখ নেই। সত্যি ভালো হয়ে গেছি।

মনসুর বলে, আরো ক'টা দিন যাক।

মরিয়ম বলে, সেলিনার নিশ্চয় পড়ার খুব ক্ষতি হচ্ছে?

মনসুর বলে, ঘাবড়াবার কিছু নেই, আপনার চাকুরি যাবে না। ওদের বলে দিয়েছি আমি, আপনার অসুখ।

মরিয়ম বলে, সত্যি আপনার কাছে অনেক ঋণী হয়ে রইলাম।

একটু ইতস্তত করে মনসুর বলে, ভালো হয়ে নিন, এক দিন না হয় এ ঋণ শোধ করার সুযোগ দেয়া যাবে আপনাকে।

বুকটা ধড়াস করে ওঠে মরিয়মের। চোখ তুলে ওর দিকে আর তাকাতে পারে না সে। বুকের কাছে কোথায় যেন একটু ভয়, একটু আনন্দ মিশে গিয়ে এক অপূর্ব অনুভূতির সৃষ্টি করে।

একদিন হাসিনা আর খোকনকে নিয়ে বেড়াতে বেরুলো মনসুর। মাকেও যেতে বলেছিলো। মা বললেন, আমি বুড়ো মানুষ, তোমরা যাও।

মনসুরের কিনে দেওয়া শাড়িখানা পরে, গলায় সেই পাথরের মালাটা জড়িয়ে বেরিয়ে যাবার সময় মরিয়মকে লক্ষ্য করে বলে গেছে হাসিনা, তুই বিছানায় শুয়ে থাক আপা, আমরা চললাম বেড়াতে। কি, খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি? মুচকি হেসে খোকনের হাত ধরে মনসুরের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে সে। ফিরে এসে উল্লাসে ফেটে পড়েছে হাসিনা।

মনসুর মোটরে করে পুরো রমনাটা ঘুরিয়েছে ওদের। রেসকোর্স, সারপেন্টাই লেক, আজিমপুর, মতিঝিল, কত জায়গায় গেছে। কি সুন্দর মনসুর ভাইয়ের মোটরটা। মাঝে মাঝে খুব জোড়ে চালাচ্ছিল আর এমন ভয় হচ্ছিলো আমার আপা!

হাসিনা বললো, খোকন বারবার পিগ পিগ করে হর্ণ দিছিলো, এত ভালো লাগছিলো আমার, বলতে গিয়ে সারা চোখ-মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিলো তার, কসবা রেস্টুরেন্টে কোনদিন গেছিস আপা? বাইরে কি গরম, আর ওখানে ঢুকলে ঠাণ্ডায় গা কাঁপে। মনসুর ভাই ওখানে নিয়ে গিয়ে পরটা-কাবাব

খাওয়ালেন। তারপর গলির মাথায় আমাদের নামিয়ে বললেন, তোমার আপা ভালো হলে সবাইকে নিয়ে আরেক দিন বেড়াতে বেরুবে। কি মজা, তাই না আপা? মরিয়মকে জড়িয়ে ধরে খুশিতে লুটিপুটি খেলো হাসিনা।

শুধু তখন নয়, পড়তে বসে, খাওয়ার সময়, শোবার আগখান দিয়েও কোথায় কোথায় গিয়েছিলো আর কি কি দেখেছে—সে সব কথা সকলকে শুধালো হাসিনা। বারবার মনসুরের প্রশংসা করলো। ওর মত এত ভালো লোক এ জীবনে সে দেখে নি। আর মনসুর ভাই দেখতে খুব সুন্দর—তাই না। আপা?

চমকে হাসিনার দিকে তাকালো মরিয়ম। কটাকটো চোখজোড়া স্বপ্নময়। আনন্দে চিকচিক করছে যেন।

তোমার কি হয়েছে হাসিনা? মনে মনে বললো মরিয়ম। জাহেদের কথা এ মুহূর্তে মনে পড়লো তার আর নিজের প্রথম যৌবনের কথা। খানিকক্ষণ সে শুধু সন্দিদ্ধ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলো তাকে। এক প্রগলভতা কেন হাসিনার?

নিজেকে প্রশ্ন করলো মরিয়ম। হাসিনার প্রতিটি গতিবিধি, কথাবার্তা, আশঙ্কাজনক বলে মনে হলো তার।

রাতে ভালো ঘুম হলো না মরিয়মের।

পরদিন সকালে অন্য দিনের মত বেরিয়ে গেলো না মাহমুদ। বেশ বেলা করে ঘুম থেকে উঠলো। কুয়োতলায় বসে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত মাজলো, মুখ হাত ধুলো। তারপর মায়ের ঘরে চা-নাস্তা করতে বসে খবরটা জানালো সে। নতুন একটা চাকরি হয়েছে তার। প্রেসে প্রফ-রিডারের চাকরি। মাসে নব্বই টাকা করে দেবে।

মেঝেতে চাটাই বিছিয়ে গোল হয়ে বসে চা খেতে বসেছিলো সবাই। মুখ তুলে একবার করে তাকালো ওর দিকে।

সালেহা বিবি প্রথম কথা বললেন, রাত জেগে কাজ করতে হবে নাতো?

মাহমুদ বললো, রাত দিন ঠিক নেই, যখন দরকার হবে তখনি করতে হবে কাজ।

সালেহা বিবি বললেন, এ আবার কেমনতর চাকরি।

আর কেউ কোন মন্তব্য করলো না।

এক মুখ মুড়ি চিবোতে চিবোতে হাসিনা বললো, মনসুর ভাইকে বললে উনি আরো একটা ভালো চাকরি যোগাড় করে দিতেন তোমায়।

মনসুর ভাইটা আবার কে? যেন কিছু জানে না। এমনভাবে সবার দিকে তাকালো মাহমুদ।

মরিয়ম যে মেয়েটাকে পড়ায় তার বড় বোনের দেবর। সালেহা বিবি জবাব দিলেন ক্ষণকাল পরে-তোমার সঙ্গে কি আলাপ হয় নি তার হবেই বা কেমন করে তুমি কি আর বাসায় থাকো?

এ ফাঁকে সেখান থেকে সরে পড়লো মরিয়ম।

হাসিনা ডাকলো-চা না খেয়ে চলে যাচ্ছিস কেন আপা?

মরিয়ম বললো, আসছি। কিন্তু সে আর এলো না।

মুখেপোরা মুড়িগুলো গিলে নিয়ে মাহমুদ বললে, বাসায় না থাকলে কি হবে, কোথায় কি হচ্ছে সে খোঁজ আমি রাখি মা। টাকার জন্যে যে তোমরা আত্ম বিক্রি করছে তা আমি জানি।

সকলে চুপ

মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেও ছেলের কথার জবাবে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছিলেন না হাসমত আলী।

হাসিনা অবাক হয়ে তাকালো মাহমুদের দিকে। এ কথার কোন অর্থ বোধগম্য হয় নি তার।

সালেহা বিবি ইতস্তত করে বললেন, যা মুখে আসে তা পট করে বলে বসিস না, বুঝলি? একটু চিন্তা করিস।

মাহমুদ পরক্ষণে জবাব দিলো, চিন্তা করার কথা আর কেন বলছি মা। লোকটার যদি টাকা পয়সা না থাকতো, সে যদি তোমার ছেলেমেয়েদের জন্যে এটা সেটা কিনে না দিতো তাহলে কি আর তাকে অমন মাথায় তুলে নাচতে তোমরা? মায়ের কাছ থেকে কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে উঠে দাঁড়ালো মাহমুদ। নিজের ঘরে চলে যাবার আগ মুহূর্তে বলে গেলো-চা-টা আমার ঘরে দিয়ে যাস তো হাসিনা।

ও চলে গেলে হাসিনা মুখ বিকৃতি করে বললো, ভাইয়াটা যে কি মিছিমিছি অন্য লোককে গালাগাল দেবে, নিজে যেন কত বড় হয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত একটা শাড়ি কিনে দিতে পারলো না আমায়, মুখে শুধু বড় বড় কথা।

ওই কথা বলে বলেই তো গেলো, যোগ করলেন সালেহা বিবি।

খোকন বললো, মনসুর ভাই কখন আসবেন?

সে কখন আসবে তাতে তোমার কি? হাসমত আলী খেঁকিয়ে উঠলেন, ওদের বাজে কথা ছেড়ে বই নিয়ে পড়তে বসো। উম্মা বিরক্তি বিতৃষ্ণা।

সালেহা বিবি বললেন, ও কী করেছে যে ওকে অমন ধমকাচ্ছে তুমি?

হাসমত আলী বললেন, আজকাল পড়ালেখা কিছু করে ও? সারাদিন তো ঐ ফুটবলটা নিয়ে আছে।

ছেলেমানুষ একটু খেলাধুলো করবে না তো কি? সালেহা বিবি জবাব দিলেন-তুমি শুধু-শুধু ওকে অমন করে ধমকিও না। চায়ের বাটি আর মুড়ির থালাগুলো হাতে নিয়ে পাকঘরে চলে গেলেন তিনি।

বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিলো মাহমুদ। চায়ের কাপটা পাশে নাবিয়ে রাখতে বইটা বন্ধ করে বললো, হাঁরে হাসি, ধর আমি যদি একটা বড় চাকরি করতাম, মাসে মাসে যদি শ-পাঁচেক টাকা আয় হতো আমার, আর তোদেরকে যতি রোজ বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতাম, এটা-সেটা কিনে দিতাম-থাওলে তোরা আমাকে খুব ভালোবাসতি তাই না?

হাসিনা বুঝলো না। অবাক হয়ে মাহমুদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো সে। তারপর ফিক করে হেসে দিয়ে বললো, তুমি পাঁচশো টাকা আয় করতে পারলে তো। বলে ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে গেলো সে।

অপমানিত বোধ করলো মাহমুদ। সে পুরুষ। পাঁচশো টাকা আয় করার মতো সামর্থ্য কোনদিন তার হবে না। হবে না এ জন্য নয় যে-তার শক্তি নেই, ক্ষমতা নেই, যোগ্যতা নেই। হবে না এ জন্য যে-তার কোন বড়লোক হিতৈষী নেই, মন্ত্রী আত্মীয় নেই, অসৎ পথে অর্থ রোজগারের প্রবৃত্তি নেই। মরিয়ম। হঠাৎ চিৎকার করে ডাকলো সে-মরিয়ম। প্রথম তার কোন জবাব এলো না। দ্বিতীয় ডাকের একটু পরে মরিয়ম সশরীরে এসে হাজির-আমায় ডাকছে?

হ্যাঁ, বসো, এক চুমুকে চায়ের কাপটা শূন্য করে একটা বিড়ি ধরালো মাহমুদ। তুমি কি করবে ঠিক করেছে।

মরিয়ম ইতস্তত করে বললো, এখনো কিছু ঠিক করি নি।

মাহমুদ বললো, কেন, ওই বড়লোকটার গলায় বুলে পড়লেই তো পারো, মন্দ কি? তীর্থক কণ্ঠস্বর।

মরিয়মের ইচ্ছে হচ্ছিলো মাটির সঙ্গে মিশে যেতে। ক্ষোভে, দুঃখে, লজ্জায় চোখমুখে জ্বালা করে উঠলো তার। এ সময় হাসিনা না এলে হয়তো কেঁদে ফেলতো মরিয়ম।

হাসিনা দরজার ওপাশ থেকে বললো, কে এসেছে দেখে যা আপা।

ওর উচ্ছাস দেখে প্রথমে মরিয়মের মনে হয়েছিলো মনসুর। আর তাই মনে হতে ভীষণ বিব্রত বোধ করছিলো সে।

হাসিনা বললো, লিলি আপা এসেছে।

মরিয়ম হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। মাহমুদ বললো, তোমার সঙ্গে কথা কিন্তু শেষ হয় নি আমার। বান্ধবীকে বিদায় দিয়ে আবার এসো।



লিলি একা আসে নি, সঙ্গে তার একটা সতেরো-আঠারো বছরে ছেলে।  
হাতে একটা ক্যামেরা। লিলি পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো, আমার মামাতো ভাই  
তসলিম, ফাস্ট ইয়ারে পড়ে। হাসিনা ফটো তুলবে বলেছিলো তাই ওকে নিয়ে  
এসেছি।

হাসিনা খুশিতে ডগমগ হলো।

মরিয়ম বললো, তোমাকে আরো আগে আশা করেছিলাম লিলি। এতদিন  
আস নি। কেন?

লিলি বললো, সারাদিন ছাত্রী পড়িয়ে বিকেলে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে  
করে না।

মরিয়ম বললো, আমার অসুখ করেছিলো, যদি মরে যেতাম!

লিলি অবাক হলো-অসুখ হয়েছিলো? আমাকে একটু খবর দিলেই তো  
পারতে, আমি কিচ্ছু জানি না।

মরিয়ম বললো, কার হাতে খবর পাঠাবো?

লিলি বললো, তোমার দাদাকে তো প্রায়ই দেখি, আমাদের স্কুলের সামনে  
একটা রেস্টোরাঁয় বসে বসে আড্ডা দেন। তার হাতে খবর পাঠালে পেতাম।

মাহমুদ সম্পর্কে লিলির মন্তব্যটা ভালো লাগলো না মরিয়মের।

হাসিনা বললো, দেখলি তো আপা, ভাইয়া সারাদিন রেস্টুরেন্টে বসে  
আড্ডা মারে, তাইতো বাসায় বেশি খায় না।

বাজে বকো না হাসিনা। মরিয়ম ধমকে উঠলো।

মুহূর্ত কয়েক আবহাওয়াটা গুমোট হয়ে রইলো।

অবশেষে পরিবেশটা হাল্কা করে দিয়ে লিলি বললো-চলো ফটো তুলবে।

হাসিনা হাততালি দিয়ে বললো, চল আপা, ভাইয়াকে ডাকবো?

তারপর তসলিমের দিকে চেয়ে বললো, আমার একটা ভালো ফটো তুলে  
দিতে হবে কিন্তু।

আপনারা কি গ্রুপ ফটো তুলবেন, না প্রত্যেকে আলাদা করে। তসলিম এতক্ষণে কথা বললো, আমার কাছে কিন্তু বেশি ফিল্ম নেই।

ফিল্ম না থাকলে এসেছেন কেন? হাসিনা পরক্ষণে জবাব দিলো, না এলেই পারতেন।

এই হাসিনা। ওর চুলের গোছা ধরে টান দিলো মরিয়ম।

তসলিমের কচি মুখখানা লাল হয়ে গেলো।

লিলি হেসে বললো, রাগ করো না হাসিনা-আরেক দিন ভর্তি ফিল্ম নিয়ে আসবে ও।

মরিয়ম বললো, বড় বেশি ফাজিল হয়ে গেছে।

ফটো তোলার জন্যে মাহমুদকে ডাকতে গেলে ও বললো, আমার অত সখ নেই।

মরিয়ম বললো, সবাই তুলছি আমরা।

মাহমুদ জবাব দিলো, তোমরা তোলা গে।

মা এসে বললো, কেন কি হয়েছে। ভাইবোন সবাই মিলে ওরা একটা ফটো তুলতে চাইছে, তাতে তোর এত আপত্তি কেন শুনি? তুই এমন হলি কেন অ্যাঁ?

উত্তরে কি যেন বলতে যাচ্ছিলো মাহমুদ। দোরগোড়ায় লিলিকে উঁকি মারতে দেখে থেমে গেলো সে। উঠে দাঁড়াতে মৃদু গলায় বললো, চলো তোমাদের যখন এত সখ হয়েছে।

কিন্তু কোথায় বসে ফটো তুলবে তা এক সমস্যা দাঁড়িয়ে গেলো। ছাদে বসে তুলবে বলে আগে ভেবেছিলো। ওরা। মাহমুদ বললো, পাগলামো আর কি। এক সঙ্গে সবাই ওখানে উঠলে ছাত্র ভেঙ্গে পড়বে।

হাসিনা বললো, একজন করে উঠলে তো হয়।

কিন্তু গ্রুপ ফটো তুলতে হলে সকলকে একসঙ্গে বসতে হবে। অবশেষে ঠিক হলো কুয়োর পাশে পাক ঘরের সামনে যে অপরিসর আঙ্গিনাটা আছে সেখানে বসবে ওরা।

ফটো তোলার ব্যাপারে হাসমত আলী কোন আপত্তি করলেন না। ছেলেমেয়েদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার সাহস তাঁর নেই। শুধু একবার মাথা চুলকে বললেন, আমায় কেন? বলতে বলতে কুয়োতলায় নেমে এলেন তিনি।

সালেহা বিবি বেঁকে বসলেন। বললেন, তোমরা তোলো, আমি দেখি।

মরিয়ম বললো, এসো না মা।

লিলি বললো, আসুন খালা আম্মা।

সালেহা বিবি বললেন, আমি বুড়ো মানুষ, আজ বাদে কাল মরবো, ফটো তুললে গুনাহ হয়। মনে তারও ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু ধর্মীয় সংস্কার বারবার বাধা দিচ্ছিলো এসে।

মাহমুদ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলো এতক্ষণ। বিরক্ত হয়ে এবার বললো, ফটো তোলার যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে এসো মা তোমাদের অত ধানাইপানাই আমার ভালো লাগে না, আমি চললাম। ও চলে যেতে উদ্যত হলো।

ওর রাগ দেখে ফিক করে হেসে দিলো লিলি।

দাঁড়িয়ে, পেছন ফিরে ওর দিকে তাকালো মাহমুদ। একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মেয়েটা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারলো না বোধ হয়। চোখ নামিয়ে নিলো। মা এতক্ষণে রাজী হলেন।

পাকঘরের সিঁড়ির ওপর পাশাপাশি বসলো।

মা-বাবা মাঝখানে। বাবার পাশে মাহমুদ। মায়ের পাশে মরিয়ম। সামনে বসলো হাসিনা, দুলু আর খোকন।

তসলিম বললো, একটু অপেক্ষা করতে হবে। রোদ ঢাকা পড়ে গেছে।  
মেঘটা সরে যাক।

একফাঁকে খোকনের মনে পড়লো তার ফুটবলটার কথা। দৌড় দিয়ে  
খাটের তলা থেকে ওটা বের করে এনে কোলে নিয়ে বসলো সে। ওর ফুটবল  
নিয়ে বসতে দেখে, দুপুর মনে পড়লো ওর পুতুলটার কথা। ছুটে গিয়ে পুতুলটা  
নিয়ে এলো সে, ওর মুখে হাসি। খোকন একবার নিজের ফুটবল আর ওর  
পুতুলটার দিকে তাকিয়ে ভ্রু বঁকালো, আর আশ্তে করে বললো, আমার দেখাদেখি।

মেঘ সরে গেছে, সকলেই ক্যামেরাটার দিকে তাকালো এবার।

গ্রুপ ফটো তোলা হয়ে গেছে। মাহমুদ চলে যাচ্ছিলো। হাসিনা পেছন  
থেকে হাত টেনে ধরলো ওর। ভাইয়া পালাচ্ছে কেন, আমি তুমি আর আপা  
একখানা তুলবো।

মাহমুদ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, বাজে আবদার করো না।

মরিয়ম ডাকলো-ভাইয়া।

নাও, তুলতে হলে তাড়াতাড়ি তোল। মাহমুদ আবার এসে বসলো  
পাকঘরের সিড়ির ওপর। মরিয়ম আর হাসিনা ওর দু-পাশে।

লিলি মৃদু মৃদু হাসছিলো আর দেখছিলো ওদের। ওর দিকে চোখ পড়তে  
মরিয়ম বললো, এসো না লিলি তুমিও এসো।

হাসিনা ডাকলো, আসুন লিলি আপা, আসুন না। ওর গলায় অবদারের  
সুর।

মাহমুদের দিকে তাকিয়ে, মুখখানা রক্তে লাল হয়ে গেলো লিলির। দ্রুত  
ঘাড় নাড়লো সে-না তুলব না।

মাহমুদ এ প্রথম বললো ওর সঙ্গে-এত লজ্জা নিয়ে আপনি শহরে বেরোন  
কি করে? ফটো তুলতে আসুন।

লিলি এবার সরাসরি তাকালো ওর দিকে। মুখখানা স্নান হয়ে গেছে তার। মাথা নেড়ে আস্তে আস্তে বললো, আপনারা তুলুন।

ফটো তোলা শেষ হলে তসলিমকে ধরে বসলো হাসিনা-আমাকে ছবি তোলা শেখাতে হবে।

তসলিম সুবোধ বালকের মত মাথা নোয়ালো, আচ্ছা।

হাসিনা বললো, আচ্ছা তো বুঝলাম, কিন্তু আপনার দেখা পাওয়া যাবে কোথায়? তসলিম সঠিক কোন উত্তর না দিতে পেরে ইতস্তত করছিলো।

হাসিনা বললো, আপনি আমাদের বাসায় আসবেন, রোজ একবার করে আসতে হবে কিন্তু।

তসলিম মৃদু হেসে সায় দিলো-আসবো।

হাসিনা সহজে ছেড়ে দিলো না তাকে। ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলো। কি করে ছবি ওঠে তা জিজ্ঞেস করলো। একটা ক্যামেরার দাম কতো জানতে চাইলো। আজকে তোলা ফটোগুলো কবে পর্যন্ত পাবে সে ব্যাপারে প্রশ্ন করলো। তসলিম কবে থেকে শিখেছে, শিখতে তার কতদিন লেগেছে, হাসিনার কতদিন লাগতে পারে, এমনি নানা আলাপের শেষে বললো, আমাকে কিন্তু শিখাতে হবে নইলে... কথাটা শেষ না করলেও অপূর্ব ভঙ্গিতে ওকে শাসলো হাসিনা।

এতদিন ঘরে বন্দি হয়ে থাকলেও আজ লিলির সঙ্গে বাইরে বেরুলো মরিয়ম। দুটি কারণ ছিলো এর পিছনে। প্রথমত মাহমুদকে এ-মুহূর্তে এড়াতে চায় সে। দ্বিতীয়ত নিরালায় বসে মনসুর সম্পর্কে লিলির সঙ্গে আলাপ করবে। একটা সিদ্ধান্ত অবিলম্বে নিতে চায় মরিয়ম।

বাসায় ফিরতে সাঁঝ হয়ে গেলো। দুপুরে লিলির ওখানে খেয়েছে সে। তারপর গল্প করতে করতে কখন বেলা পড়ে এসেছে সে খেয়াল ছিলো না।

বাইরে থেকে হাসিনার উচ্ছসিত গলার স্বর শুনে বুঝতে পেরেছিলো, মনসুর এসেছে।

মাহমুদ ঘরে আছে কিনা উঁকি মেরে দেখে, বারান্দায় বার কয়েক হেঁচট খেয়ে যখন ভেতরে এলো মরিয়ম, তখন সকাল বেলা ফটো তোলা ব্যাপারটা মনসুরকে শোনাচ্ছিলো হাসিনা। তসলিম তাকে ফটো তোলা শেখাবে বলেছে। সে খুব ভালো ছেলে-বড় ভালো-এসব কথাও তাকে বলছিলো সে।

মনসুর অন্যমনস্কভাবে শুনছিলো সব। মরিয়মকে দেখে মুখখানা মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে স্নানতায় ফিরে এলো।

কখন এসেছেন আপনি? ভেতরে এসে প্রশ্ন করলো মরিয়ম।

অনেকক্ষণ। স্নানমুখে বললো মনসুর, আপনি বুঝি আবার বেরুতে শুরু করেছেন?

মৃদু হেসে ওর পাশ কাটিয়ে এসে বিছানার ওপর বসলো মরিয়ম। ময়লা চাদরটার দিকে চোখ পড়তে, হাসিনার প্রতি একটা কটাক্ষ হানলো সে।

হাসিনা আবার ফটো তোলার খবর শোনাতে লাগলো। তারপর বললো, আমাকে একটা ক্যামেরা কিনে দিতে হবে মনসুর ভাই।

মনসুর হেসে দিয়ে বললো, কিনে দেবো।

মরিয়ম উসখুস করছিলো। অকস্মাৎ হাসিনার দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি একটু বাইরে যাও হাসি, মনসুর সাহেবের সঙ্গে আমার কিছু আলাপ আছে। গলার স্বরটা অদ্ভুত শোনালো মরিয়মের।

মনসুর অবাক চোখে তাকালো ওর দিকে।

একবার মরিয়ম, আরেকবার মনসুরের দিকে তাকিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো হাসিনা।

একেবারে চলে গেলো না সে। বারান্দায় আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে রইলো।

দুজনে নীরব।

মরিয়ম ভাবছিলো কী করে কথাটা বলা যায় ওকে।

মনসুর শঙ্কিত হলো, চরম মুহূর্তটি বুঝি আজ এলো ওর সামনে।

আরো অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, অদূরে টেবিলটার দিকে তাকিয়ে মরিয়ম বললো, আপনি রোজ রোজ এখানে কেন আসেন?

যা আশঙ্কা করছিলো মনসুর।

সারা দেহে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর এলো।

ক্ষণকাল পরে সে বললো, সে কথা কি এ মুহূর্তে শুনতে চান আপনি?

ওর চোখে চোখ পড়তে দ্রুত চোখজোড়া নাবিয়ে নিল মরিয়ম।

হ্যাঁ। গলাটা কেঁপে উঠলো তার।

আবার নীরবতা।

নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলো মনসুর। বার-কয়েক ঢোক গিলে অবশেষে বললো, আমি আপনাকে ভালবাসি।

অপ্রত্যাশিত কিছু ছিলো না, তবু সারা দেহ দুলে উঠলো মরিয়মের। জীবনে আরেকটি ক্ষণ, মুহূর্ত মনে পড়ে গেলো। বুকটা দুরন্দুরু কাঁপছে ভয়ে-আনন্দে। মুখ তুলে ওর দিকে তাকাতে পারলো না মরিয়ম। মনে হলো, ওর দৃষ্টির সামনে থেকে যদি নিজেকে এখন কোথাও লুকিয়ে ফেলতে পারতো সে? বিছানার চাদরটাকে ডান হাতে আঁকড়ে ধরলো মরিয়ম। ওকে চুপ থাকতে দেখে অদ্ভুত গলায় মনসুর আবার বললো, আমি জানি আপনি কি ভাবছেন। যদি অন্যায় কিছু বলে থাকি তাহলে ক্ষমা করে দেবেন আমায়। আরেক বার ঢোক গিললো সে। কথাগুলো ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না আমি, আপনি বিশ্বাস করুন, জীবনে এই প্রথম একটি মেয়েকে ভালবেসেছি আমি। যেদিন আপনাকে প্রথম দেখি সেদিন।

কথার খেই হারিয়ে ফেললো মনসুর।

সমস্ত দেহটা কুঁচকে একটুখানি হয়ে এলো মরিয়মের। ভয় আর আনন্দ। মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলো না সে। খানিকক্ষণ পরে মনসুর আবার বললো, আপনি হয়তো মনে মনে ঘৃণা করতে পারেন আমাকে, কিন্তু যেদিন আপনাকে প্রথম দেখি সেদিনই ঠিক করেছিলাম আপনাকে বিয়ে করবো।

মরিয়ম চমকে তাকালো ওর দিকে।

একজোড়া যন্ত্রণাকাতর চোখ।

পরক্ষণে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো মরিয়ম। কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, বাবাকে বলবেন, দয়া করে এসব কথা বাবাকে বলবেন। আমি কিছু জানি না বলে তার সামনে থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো মরিয়ম।

আর এলো না।

বিয়ের আনুষঙ্গিক আয়োজনগুলো যত সহজে সারা যাবে বলে মনে করেছিলেন হাসমত আলী, কাজে নেমে দেখলেন সেগুলো তত সহজ নয়। টাকা-পয়সার স্বল্পতা পরিকল্পনাগুলোকে বানচাল করে দেয়। তবু বড় প্রসন্ন হাসমত আলী।

মেয়ের জন্যে এমন পাত্র কোনদিন আশা করেননি তিনি। কল্পনাও ছিলো না। তবে, যেদিন থেকে মনসুর এ বাড়িতে আসা-যাওয়া শুরু করে সেদিন থেকে সালেহা বিবির সঙ্গে এ বিষয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা করেছেন তিনি। আশা নিরাশায় দুলেছেন দুজনে। স্বপ্ন দেখেছেন।

অবশেষে স্বপ্ন তাদের সফল হতে চলেছে।

ভয় ছিলো একটি, সে হলো মাহমুদ। তাঁরা ভেবেছিলেন মাহমুদ এ বিয়েতে বিরোধিতা করবে। ঝগড়া বাধাবে। অকারণে হৈ চৈ করবে। বাধা না দিলেও প্রতিবাদ অবশ্য করেছে মাহমুদ। বলেছে-তোমাদের মেয়ের বিয়ে দেবে



সে তোমরা জানো, তোমাদের মেয়ে জানে। আমাকে শুধু শুধু জিজ্ঞেস করতে এসেছো কেন মা?

সালেহা বিবি বলেছেন সে কি, তোকে জিজ্ঞেস করবো নাতো কাকে জিজ্ঞেস করবো, তুই হলি বড় ছেলে।

মায়ের কথা শুনে হেসেছে মাহমুদ। হাসি থামিয়ে গম্ভীর গলায় বলেছে, দেখো মা, আমার মতামত যদি চাও তাহলে বলবো, এ বিয়েতে মত নেই আমার। অবশ্য আমার মতামতের ওপর ওটা নাকচ করে দাও, সেটা আমি চাই নে।

এ আবার কেমনতর কথা হলো, সালেহা বিবি অবাক হয়ে বললেন, তোর মত থাকবে না কেন, এর চেয়ে ভালো বর আর কোথায় পাবি ওর জন্যে?

মাহমুদ বললো, মা, কেন মিছামিছি আমার মেজাজটা চড়াচ্ছে। ভালো খারাপের কতটুকু তুমি জানো? যে লোকটার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে বলে আহ্লাদে আটখানা হচ্ছে তার চরিত্র বলে কোনো পদার্থ আছে কিনা খোঁজ নিয়েছো?

দেখ মুখে যা আসে তা বলে দিস না, একটু ভাবিস। সালেহা বিবি বিরক্তির সাথে বললেন, কে বললো তোকে ওর চরিত্র খারাপ?

মুখ কালো করে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো মাহমুদ। তারপর ধীরে ধীরে বললো, মা, তুমি বুঝবে না, মরিয়মকে ডেকে জিজ্ঞেস করো এ দেশে কটা লোক আছে যে তার চরিত্র ঠিক রেখে বড়লোক হতে পেরেছে? অন্যকে ফাঁকি দিয়ে, ধোঁকাবাজ আর লাম্পট্য করে, শোষণ আর দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে টাকা রোজগার করে বড়লোক হয়েছে সব। তাদের আবার চরিত্র! ও-সব বাজে কথা আমাকে শুনিয়ে না মা। তোমাদের মেয়ে তোমরা বিয়ে দাওগে, আমার কোন মতামত নেই।

পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরালো মাহমুদ।

উঠে দাঁড়িয়ে চলে যাবার পথে মা আন্তে করে বললেন, তোমার মত থাকুক কি, না থাকুক এ বিয়ে হবে।

মা চলে গেলে, একটা বই খুলে বসে বার কয়েক বিড়িতে জোর টান দিলো মাহমুদ।

ওর মতামতটা মরিয়মের কাছেও অজানা ছিলো না। তাই, পারতপক্ষে মাহমুদের সামনে আসে না সে। যতক্ষণ মাহমুদ ঘরে থাকে ততক্ষণ খুব সাবধানে চলাফেরা করে মরিয়ম। কখনো সামনে পড়ে গেলে, লজ্জায় চোখমুখ লাল হয়ে আসে। পাশ কাটিয়ে একপাশে সরে যায় সে।

আরেকটা ব্যাপারে বড় শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলো মরিয়ম। আনিসা বেগমকে কি করে মুখ দেখাবে সে। সেলিনাকে মনসুরের কাছে বিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। কথা প্রসঙ্গে মনের বাসনাটা জানিয়েও ছিলেন মরিয়মকে। তাকে বড় বিশ্বাস করতেন তিনি। অবশেষে যেদিন মরিয়মের সঙ্গে বিয়ের কথা শুনবেন সেদিন ওর সামনে কি করে গিয়ে দাঁড়াবে মরিয়ম?

ইদানীং সেলিনাকে পড়াতে যায় সে।

সম্পর্কটা আগের মতই আছে। কিন্তু আর কতদিন এভাবে চলবে সেটা জানে না মরিয়ম। একদিন নিশ্চয় খবরটা যাবে ওদের কানে। যাক, সে নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না সে। তার চেয়ে বিবাহিত জীবনের সুন্দর কল্পনা করতে ভালো লাগে। ভয় আর আনন্দ মেশানো এক অপূর্ব অনুভূতি।

হাসিনা সবচেয়ে খুশি।

বিয়ের পর ওকে একটা ক্যামেরা কিনে দেবে কথা দিয়েছে মনসুর। তসলিমের কাছে ও ছবি তোলা শিখছে। তার সঙ্গে বসে আপার বিয়ের সময় ঘরগুলো কিভাবে সাজাবে তা নিয়ে পরিকল্পনা করে সে। একটা বাঁশের গেট তৈরি করতে হবে বাড়ির সামনে। কিছু পটকা বাজী কিনবে ওরা। আর কয়েক

দিস্তা লাল নীল কাগজ। হ্যাঁ, একটা উপহার ছাপাতে হবে সবার নামে। তোমার নামটাও ওখানে থাকবে তসলিম ভাই, তাই, না? তসলিম মাথা নুইয়ে সায় দেয়—হ্যাঁ।

কিন্তু ঐ সবেৰ জন্য টাকার দরকার। বাবার কাছ থেকে কিছু পাওয়া যাবে না জানতো হাসিনা। মাহমুদ শুনলে রাগ করবে। তাই চুপি চুপি মনসুরের কাছ থেকে দশটা টাকা আদায় করে নিয়েছে সে। কাউকে বলে নি, বলেছে শুধু তসলিমকে। ওকে দিয়ে কেনাবে সব। আর জানিয়েছে মাকে। মা বললেন, খবরদার মাহমুদের কানে যেন না যায়। বড় বোনের বিয়ে, একটু আমোদ-ফুর্তি করবি না তো কী?

হাসিনা বলে, আমায় নতুন একটা শাড়ি কিন্ত কিনি দিতে হবে মা।

মা বললেন, বলেছি তো কিনি দেবো।

হাসিনা খুশিতে ঘরময় নেচে বেড়ায়।

মনসুর আজকাল আসা বন্ধ করেছে। মরিয়ম নিষেধ করেছে তাকে। ও এলে মরিয়ম বিব্রত বোধ করে। ওর সামনে আসতে লজ্জা লাগে মরিয়মের। আমার কথা ভেবে, এ কটা দিন আর এসো না তুমি। মনসুরকে বলেছে সে। যদি দেখা করতে হয় বাইরে করো, কিন্তু সেলিনাদের ওখানে নয়।

একদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পরে মাহমুদকে ডেকে বসলেন হাসমত আলী। সালেহা বিবিও একখানা পাখা হাতে বসলেন তাদের পাশে। বিয়ের তারিখটা ঘনিয়ে আসছে। কাদের নিমন্ত্রণ করতে হবে। কি খাওয়ানো যেতে পারে। কত টাকার প্রয়োজন তার একটা হিসেব করলেন হাসমত আলী।

মাহমুদ বললো, দলসুদ্ধ লোক নিমন্তন করার দরকার নেই। যাদের না করলে নয় তাদের দাওয়াত করো।

সালেহা বিবি বললেন, কাউকে বাদ দিলে তো চলবে না, বড় মেয়ের বিয়ে—।

তাই বলে সবাইকে দাওয়াত করতে হবে নাকি। অত লোক খাওয়াবে কি করে? হাসমত আলী ছেলের পক্ষ নিলেন। টাকার চিন্তা বারবার বিভ্রান্ত করছিলো তাকে। কেরানীর জীবনে সঞ্চয় সম্ভব নয়। হাসমত আলীও কিছু জমাতে পারে নি। অথচ ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতে হলে মোটা অঙ্কের না হোক মোটামুটি একটা অঙ্কের প্রয়োজন।

মাহমুদ বললো, দেখি এ মাসে বেতনটা যদি অগ্রিম পাওয়া যায় তাহলে পুরোটা দিয়ে দেবো আমি।

সালেহা বিবি বললেন, তাহলে তুই চলবি কেমন করে?

সে কথা তোমাকে ভাবতে হবে না মা। মৃদু গলায় জবাব দিলে মাহমুদ। কাদের দাওয়াত করতে হবে একটা তালিকা তৈরি করলেন হাসমত আলী। কি খাওয়ানো হবে সে সম্পর্কেও আলোচনা হলো, ক্রমে রাত বাড়লে মাহমুদ ঘুমোতে চলে গেলো।

ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে শুধু জেগে রইলেন অনেক রাত পর্যন্ত। টাকার কথা ভাবছিলেন ওঁরা।

সালেহা বিবি ফিসফিস করে বললেন, মরিয়মকে দিয়ে মনসুরের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার চাইলে ও নিশ্চয় দেবে।

হাসমত আলীও তাই ভাবছিলেন। এমনি হাত পাতা যাবে না। ধার চাইতে হবে। পরে শোধ করতে যে পারবেন না, তা জানেন তিনি। তবু ধার চাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু মাহমুদ যদি জানতে পারে তাহলে বাড়িগুদ্ধ মাথায় তুলবে।

হাসমত আলী চাপা গলায় বললেন, চাইলে নিশ্চয় দেবে, কিন্তু মাহমুদ কি জানবে না ভেবেছো?

সালেহা বিবি বললেন, জানুক। জানলে কি হবে, ও পারবে অতগুলো টাকা যোগার করে দিতে?

স্ট্রীর কথায় আশ্বস্ত হতে পারলেন না হাসমত আলী। ইতস্তত করে বললেন, এক কাজ করলে হয় না, অন্য কারো কাছ থেকে কর্জ নিলে।

শোধ করবে কেমন করে? পরক্ষণে সালেহা বিবি জবাব দিলেন তাছাড়া দুটো মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে সে খেয়াল আছে? হাসিনা আর দুলুর কথা বলছেন সালেহা বিবি।

ওদের বিয়ে দিতে হবে একদিন।

বাতি নিভিয়ে দিয়ে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে আরো অনেকক্ষণ আলাপ করলেন ওরা। টাকা সংগ্রহের বহুবিধ উপায় নিয়ে জল্পনা কল্পনা করে অবশেষে দুজনে নীরব হলেন।

রাতে ভাল ঘুম হলো না ওদের।

পরদিন সকালে চা খেতে বসে মাহমুদ বললো, দেখো মা, খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলা না করে, নাস্তাপানি খাইয়ে সকলকে বিদায় দেবার বন্দোবস্ত করো। গরিবের অত ভোজ খাওয়ানোর চিন্তা না করাই ভালো। মা বললেন, গরিব হয়েছি বলে বুঝি স্বাদ-আত্নাদ নেই আমাদের?

মাহমুদ মৃদু হাসলো। তারপর হাসি থামিয়ে বললো, মা, রোজ পাঁচ বেলা যার কাছে মাথা ঠোকো, তাকে ভুলেও কি একবার জিজ্ঞেস করতে পারো না, এত স্বাদ-আত্নাদ দিয়ে যদি গড়েছেন তোমাদের, সেগুলো পূরণ করার মত সামর্থ্য কেন দেননি?

এ-কথার তাৎপর্য ঠিক ধরতে পারলেন না সালেহা বিবি। তাই চুপ করে রইলেন তিনি।

ও ঠিক বলছে। ছেলেকে সমর্থন জানালেন হাসমত আলী-অত ভোজ দেবার কি দরকার, আমাদের সামর্থ্য যখন নেই-। কথাটা শেষ করলেন না তিনি।

সালেহা বিবি বললেন, সামর্থ্য কজনের থাকে। তাই বলে কি তারা বড় মেয়ের বিয়েতে নাস্তা পানি খাইয়ে মেহমান বিদায় করে? আমার পোড়া কপাল নইলে-দু-চোখে পানি এসে জমা হলো তাঁর। আঁচলে চোখ মুছলেন তিনি।

মায়ের কান্না দেখে আর কোন কথা বলতে সাহস পেলো না মাহমুদ। চা-টা শেষ করে নীরবে উঠে গেল সে। হাসমত আলী বার কয়েক মাথা চুলকালেন তারপর দুহাটুর মধ্যে মুখ গুঁজে চুপচাপ কি যেন ভাবতে লাগলেন তিনি।

আজ মরিয়মের বিয়ে। সকাল থেকে পুরো বাড়িটায় উৎসব। মেহমান, অতিথি, গিজগিজ করছে ঘরগুলো, বারান্দা, কুয়োতলা।

ভোরে ভোরে পাকঘরে ঢুকেছে সালেহা বিবি। সেখান থেকে আর বেরোয় নি। পাড়ার কয়েকজন বয়স্ক মহিলা-যাদের ওরা নেমন্তন করেছিলো-কাজের সহায়তা করছে তাঁকে।

হাসিনা, খোকন আর তসলিম আগের রাতে সাদা সুতোয় লাল-নীল কাগজ এঁটে ঘরগুলো সাজিয়েছে। সামনে একটা বাঁশের তোরণ তৈরি করেছে তারা। মাহমুদের ঘরটায় বরযাত্রীদের এনে বসানো হবে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে, ওর বইপত্র আর কাগজগুলো মায়ের খাটের নিচে একটা চাটাই বিছিয়ে তার ওপর রেখে এসেছে মাহমুদ। কুয়ো থেকে পানি তুলে এনে নিজ হাতে ঘরটা ধুয়ে-মুছে দিয়েছে সে। লিলি এসেছে। সেলিনাও এসেছে আজ। ওকে নিজে গিয়ে আমন্ত্রণ জানাতে সাহস পায়নি মরিয়ম। চিঠি লিখে জানিয়েছে। আনিসা বেগমের মুখোমুখি হতে ভয় ওর। সেলিনাকে দেখে বেশ খুশি হয়েছে বলে মনে হলো। মনসুর ভাই-এর সঙ্গে মরিয়ম আপার বিয়ে আনন্দ যেন উপছে পড়ছে ওর চোখেমুখে। মা আসতে নিষেধ করেছিলেন। তবু চুপি চুপি চলে এসেছে সেলিনা। ওরা সব মরিয়মের ঘরে, ঘিরে বসেছে ওকে। গল্প করছে, হাসছে, কৌতুকে ফেটে পড়ছে মাঝে মাঝে।

হাসমত আলী পাকঘরে গিয়ে একবার সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে এলেন, দুপুরের মধ্যে সবকিছু তৈরি হওয়া চাই। অপরাহ্নে বর আসবে।

মাহমুদ সব আয়োজন শেষ করে ফরাসের উপর চিং হয়ে শুয়ে বিড়ি ধরালো একটা। অন্য ঘরে আত্মীয়-স্বজনেরা এসে ভিড় জমালেও এখানে সকলকে আসতে নিষেধ করেছে। চিংকারে মাথা ধরে ওর।

লিলি উঁকি মেরে চলে যাচ্ছিলো।

মাহমুদ ডাকলো ওকে, শুনুন।

লিলি ফিরে এসে বললো, আমায় ডেকেছেন? সারা গায়ে ঘাম ঝরছে তার। শাড়ির আঁচল দিয়ে বার বার মুখ মুছেছে।

মাহমুদ বললো, ওখানে হৈ হট্টগোলের মধ্যে যদি আপনাদের ভালো না লাগে, এখানে এসে বসতে পারেন। আমি বাইরে বেরুচ্ছি।

লিলি মৃদু হেসে বললো, ধন্যবাদ।

মরিয়ম আর সেলিনাকে নিয়ে এ ঘরে দরজায় খিল এঁটে দিলো লিলি। বাক্সাঃ গরমে সেদ্ধ হয়ে যাবার অবস্থা। ফরাসের উপর শুয়ে শাড়ির আঁচলে গায়ে বাতাস দিতে লাগলো ওরা।

হাসিনা কড়া নাড়ছিলো।

প্রথমে কেউ সাড়া দিলো না। পরে সে যখন দরজার উপর দুমদাম শব্দে কিল চাপড় দিতে লাগলো তখন উঠে দরজাটা খুলে দিলো সেলিনা।

ভেতরে এসে হাসিনা বললো, এখানে শুয়ে শুয়ে কি করছো তোমরা, আমি খুঁজে-খুঁজে হয়রান। দরজায় খিল এঁটে ওদের পাশে শুয়ে পড়লো সে।

লিলি বললো, বিয়ের পর আমাদের ভুলে যাবে না তো ম্যারি?

মরিয়ম হাসলো। কিছু বললো না।

সেলিনা ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞেস করলো, বিয়ের পর আমাকে আর পড়াতে যাবে না তুমি, তাই না আপা?

মরিয়ম ওর চুলে সিঁথি কেটে দিয়ে বললো, যেতাম, কিন্তু তোমার মা যে আর ও বাড়িতে ঢুকতে দেবে না আমায় সেলিনা।

আপার মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলো সেলিনা। তারপর বললো, আচ্ছা আপা, মা তোমার বিয়ের খবর শুনে অমন রেগে গেছেন কেন? বারবার শুধু গালাগাল দিচ্ছিলেন তোমাকে। আমাকেও।

হাসিনা পরস্পরে বললো, আপনার মায়ের ভীমরতি হয়েছে।

মায়ের সম্পর্কে কটু মন্তব্য শুনে মুখখানা কালো হয়ে গেলো সেলিনার।

মরিয়ম ধমকের সুরে বললো, বাজে বকো না হাসিনা, এখান থেকে যাও।

হাসিনা পাশ ফিরে শুলো।

বাইরে বিয়েবাড়ির হাঁক-ডাক, হৈ-হুল্লোড় আর ধূপধাপ শব্দ এখান থেকেই শোনা যাচ্ছে। পাড়ার প্রবীণেরা বাইরে দাওয়ায় বসে সুখ্যাতি গাইছে বরের-হাসমত আলীর কপাল, নইলে, অমন বড়লোক বর ক'জনের ভাগ্যে জোটে!

লিলি মুখখানা মরিয়মের মুখের কাছে বাড়িয়ে এনে, ওর চিবুকটা নেড়ে দিয়ে ফিসফিস করে বললো, কার কথা ভাবছিস ম্যারি, বরের কথা বুঝি?

ধ্যাৎ। লজ্জায় লাল হয়ে গেলো মরিয়ম। কপট অভিমানে মুখখানা অন্য দিকে সরিয়ে নিলো সে।

দুপুরে, যথা সময়ে বরযাত্রীরা এলো।

গলির মাথায় একসার মোটর থামিয়ে, নোংরা আবর্জনা পেরিয়ে আসতে বেশ কষ্ট হলো ওদের।

ঘরে পাখা নেই, গরমে হাঁসফাঁস করলো তারা। কলকল শব্দে কথা বললো।

খেলো।

পান চিবোল।



বিয়েটা নির্বিঘ্নে হয়ে গেলো মরিয়মের।

কন্যা সম্প্রদানের সময় হু হু করে কেঁদে দিলেন হাসমত আলী। সুখী হও মা, সুখে থেকো।

সালেহা বিবি আঁচলে মুখ মুছলেন, কুয়োতলায় বসে ডুকরে কাদলেন। পাড়ার বয়স্কা মহিলারা সান্ত্বনা দিলেন তাকে।

এ সময়ে কাঁদতে নেই বউ। সব মেয়ে কি চিরকাল বাপের বাড়ি থাকে? হাসিনার চোখেও অশ্রু। কান্না লুকোতে গিয়ে দরজার আড়ালে মুখ লুকালো সে।

মাহমুদ নির্বাক। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে সে শুধু নীরবে চেয়ে-চেয়ে দেখছিলো, কেমন করে একটি মেয়ের জীবন এক ছেলের জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে গেলো এক মুহূর্তে।

রাতের প্রথম প্রহরে কনে নিয়ে চলে গেলো ওরা।

সঙ্গে খোকন গেলো। তসলিম গেলো। কয়েকজন নিকট ও দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও গেলো কন্যাপক্ষ হয়ে।

মাহমুদকে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছিলো সকলে, ও গেলো না। ফরাসের উপর চুপচাপ শুয়ে রইলো সে।

মেহমান অতিথি যারা এসেছিলো তারা বিদায় নিয়ে গেছে অনেক আগে। সেলিনা চলে গেছে। পাড়ার বউ ঝিয়েরাও। লিলিকে যেতে দেয় নি হাসিনা। বলেছে, আজ রাতে তুমি থাক লিলি আপা, নইলে একা ভীষণ ভয় করে আমার।

লিলি বলেছে, পাগল, বাসায় না গেলে বকবে সবাই।

সালেহা বিবি বলেছেন, যাবে আর কি, আরো কিছুক্ষণ থেকে যাও না, রাতে খেয়ে যেয়ো।

লিলি গেলো না। পাকঘরে সবকিছু গোছাবার কাজে মাকে সহায়তা করলো হাসিনা আর লিলি।

একটু আগে যে বাড়িটা গমগম করছিলো মানুষের কোলাহলে, এখন সেখানে কবরের নিস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে থালাবাসনগুলো নাড়াচাড়া আর কুয়োতলায় পানি তোলার শব্দ হচ্ছে।

তন্দ্রায় দুচোখ জড়িয়ে এসেছিলো মাহমুদের।

হাসিনার ডাকে তন্দ্রা ছুটে গেলো।

হাসিনা বললো, ভাইয়া খাবে এসো।

মাহমুদ বললো, তুই যা আমি আসছি। পরক্ষণে কি মনে হতে আবার বললো, হ্যারে, সবাই কি চলে গেছে?

হাসিনা বললো, হ্যাঁ, শুধু লিলি আপা আছে।

মায়ের ঘরে এসে মাহমুদ দেখলো বাবা কাত হয়ে শুয়ে আছেন খাটের ওপর। দুলু ঘুমোচ্ছে। খোকন মেঝেতে বসে দুলুর পুতুলগুলো নিয়ে খেলছে। আজ ওর ছুটি। হাসিনা আর লিলি কুয়োর পাড়ে বসে গল্প করছে।

খাওয়া শেষ হলে লিলি বললো, এবার যাই আমি আসি।

সালেহা বিবি বললেন, এত রাতে যাবে তুমি?

লিলি বললো, পারবো খালাম্মা।

মাহমুদকে পেয়ে সালেহা বিবি বললেন, তুই কি বাইরে বেরুবি আজ?

মাহমুদ বললো, হ্যাঁ, এখনি বেরুবো। সারাদিন তো তোমাদের বিয়ের ঝামেলায় কাটলো। এখন সারারাত জেগে প্রফ দেখতে হবে আমায়। কিন্তু কেন বলতো?

সালেহা বিবি ইতস্তত করে বললেন, লিলি মেয়েটা একা যাচ্ছে, ওকে একটু এগিয়ে দিয়ে-। কথাটা শেষ করলেন না তিনি।

মাহমুদ ওর দিকে এক পলক তাকিয়ে বললো, দিতে পারি ওর যদি আপত্তি না থাকে।

লিলি ঢোক গিললো, কিছু বললো না।

রাতের এই প্রহরে পথঘাটগুলো বড় নির্জন হয়ে আসে। টিমটিমে বাতি-জ্বলা দোকানীরা শেষ খদ্দেরের প্রত্যাশায় তখনো বসে। আশে-পাশে কোন রিক্সা নেই।

লিলি বললো, আপনার যদি কোন অসুবিধা না হয় যেতে পারেন, আমার কোন আপত্তি নেই।

তারপর নীরবে দুজনে হেঁটে চললো ওরা। কখনো আগে-পিছে। কখনো পাশাপাশি। মাহমুদ কি যেন ভাবছিলো। হঠাৎ সে বললো, কি অদ্ভুত! তাই না?

লিলি চমকে তাকালো ওর দিকে-কী?

মাহমুদ বললো, এই বিয়েটা।

লিলির কিছু বোধগম্য হলো না। অবাক হয়ে শুধালো-বিয়েটা মানে?

হ্যাঁ এই বিয়েটার কথা বলছিলাম। মাহমুদ ধীরে ধীরে বললো, কতগুলো লোক এলো, খেলো আর হাত তুলে মোনাজাত করলো, ব্যাস, একটা মেয়ের জীবন আরেকটা ছেলের জীবনের সঙ্গে চিরকালের জন্যে গেঁথে গেলো। এই ফার্সটা না করলেও তো চলে।

লিলি ফিক করে হেসে দিয়ে বললো, বিয়ে বুঝি ফার্স বলে মনে হয় আপনার কাছে?

মাহমুদ মুখ ঘুরিয়ে তাকালো ওর দিকে। একটা তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টি। সে দৃষ্টি সব কিছু অস্বীকার করতে চায়। সারা পথ আর একটি কথাও বললো না মাহমুদ। লিলিকে তার বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যখন প্রেসে এসে পৌঁছলো তখন রাত সোয়া এগারোটা। টেবিলের ওপর স্তম্ভাকার প্রফসিটগুলো রাখা আছে। ওগুলো দেখে শেষ করতে রাত দুটো তিনটে বেজে যাবে। তারপর বাসায় ফিরবে না মাহমুদ। লম্বা টেবিলটার ওপর গুটিসুটি হয়ে শুয়ে রাত কাটিয়ে দেবে।

একটা বিড়ি ধরিয়ে চেয়ারটা টেনে বসে পড়লো মাহমুদ। পরদিন ভোরে বিশ্রামাগারে যখন এলো সে, তখন চোখজোড়া ভয়ানক জ্বালা করছে।

রেস্তোরাঁয় আর কোন খন্দের আসেনি এখনো। খোদাবক্স টেবিল চেয়ারগুলো সাজাচ্ছে আর চাকর ছোড়াটা আগুন দিচ্ছে চুলোয়। ওকে আসতে দেখে খোদাবক্স বললো, ইয়ে হয়েছে মাহমুদ সাহেব, আপনাকে যেন বড় কাহিল কাহিল মনে হচ্ছে আজ?

মাহমুদ একখানা চেয়ারের ওপর ধপ করে বসে পড়লো, ইয়ে হয়েছে এক কাপ কড়া চা বানিয়ে দাও জলদি করে। থাকলে চায়ের সঙ্গে একটা টোট দিও।

ছেলেটা একটা পাখা এনে জোরে বাতাস করতে লাগলো চুলোয়। কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে উপরে, ধীরে ধীরে আগুনের শিখাগুলো উঁকি মারলো। কালো চায়ের কেটলিটা চুলোর উপর তুলে দিলো সে। টেবিল চেয়ারগুলো ঠিকভাবে সাজানো হয়েছে কি না দেখে নিয়ে খোদাবক্স বললো, আজ বুঝি নাইট ডিউটি ছিলো? খোদাবক্স জানতো না যে মাহমুদ ও-চাকরিটা অনেক আগে ছেড়ে দিয়েছে।

মাহমুদ টেবিলের উপর মাথা রেখে বললো, তোমার মাথা, চাকরি আমি কবে ছেড়ে দিয়েছি।

খোদাবক্স অবাক হয়ে বললো, কই কিছু বলেন নি তো আপনি?

তোমাকে সব কিছু বলতে হবে নাকি?

ধমক খেয়ে চুপ করে গেলো খোদাবক্স, তাড়াতাড়ি চা বানিয়ে দেবার জন্যে ছেলেটাকে তাড়া দিলো। তারপর দুঠোঁটে হাসি টেনে আবার বললো, আপনার বন্ধু নঈমের একটা চাকরি হয়েছে, শুনেছেন কি মাহমুদ সাহেব?

শুনি নি, এই শুনলাম। দু-বাহর আড়ালে মুখ লুকালো মাহমুদ।

ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন খন্দের এসেছিলো, তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করলো খোদাবক্স। খাতাপত্র দেখে কি যেন হিসেব করলো। ড্রয়ারটা খুলে খুচরো পয়সাগুলো নেড়েচেড়ে দেখলো। তারপর আবার বললো, ইয়ে হয়েছে মাহমুদ সাহেব, শুনলাম আপনার বোনের বিয়ে হয়েছে কাল?

এক চুমুক চা খেয়ে মাহমুদ বললো, তুমি জানলে কোথা থেকে?

খোদাবক্স ইতস্তত করে জবাব দিলো, না কাল আপনি আসেন নি কিনা, ওরা সবাই আলোচনা করছিলো।

হুঁ-কাপটা পিরিচের উপর থেকে আবার তুলে নিলো মাহমুদ।

খোদাবক্স মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো, ইয়ে হয়েছে মাহমুদ সাহেব, শুনলাম ছেলের নাকি গাড়ি আছে।

হ্যাঁ।

তাহলে তো আপনার আর কোন চিন্তা নেই মাহমুদ সাহেব, এবার একটা চাকরি নিশ্চয় পাবেন। গদগদ গলায় বললো খোদাবক্স।

একটা টোষ্ট আর এক কাপ চা লিখে রাখুন। মাহমুদ উঠে দাঁড়ালো। বেরুতে যাবে এমন সময় হস্তদন্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো রফিক। এই যে মাহমুদ, তোমার কথা ভাবতে ভাবতেই আসছিলাম। তুমি কি চলে যাচ্ছে নাকি? একটু বসো প্লিজ বসো, একটু। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে আমার।

মাহমুদ বললো, পরে বলো এখন ভালো লাগছে না আমার, বাসায় যাবো।

একটু বসে যাও, এই একটু। ওর গলায় করুণ আকুতি। প্রেমে পড়ার পর থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছে সে।

মাহমুদ বসলো। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসলো রফিক। তারপর হাসি থামিয়ে বললো, এবার তুমি নিশ্চয় হতাশ করবে না আমায়, মাহমুদ।

মাহমুদ বললো, খোলাসা করে বলো, কিছু বুঝতে পারলাম না।

তোমার বোনের বিয়ের খবর আমরা পেয়েছি মাহমুদ। যদিও তুমি কিছুই জানাও নি।

মাহমুদ জবাব দিলো, আমার বোনের বিয়েটেত তোমাদের কিছু জানাবার ছিলো বলে মতো মনে হয় না।

না না, আমি সে কথা বলছি না। লজ্জা পেয়ে রফিক পরক্ষণে বললো, তুমি অল্পতেই সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ো। আমি বলছিলাম কি তোমার ভগ্নিপতির হাতে অনেক চাকরি আছে শুনেছি। তুমি যদি আমার হয়ে তাকে একটু বলো; কিম্বা তাকে চিঠি লিখে দাও।

ও এই ব্যাপার। মুখখানা কালো হয়ে গেলো মাহমুদের।

আমার জন্যে অন্তত এইটুকু তুমি করো মাহমুদ। নইলে মেয়েটির ওরা বিয়ে দিয়ে ফেলবে অন্য কোথাও। মনে হচ্ছিলো সে এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে। ডুকরে গড়িয়ে পড়বে ওর পায়ের ওপর।

মাহমুদ নির্বাক চোখে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। তারপর মৃদু গলায় বললো, তার চেয়ে একখানা ছুরি নিয়ে আমার গলাটা কেন কেটে দাও না বন্ধু?

তোমার কি আমার জন্যে এতটুকু অনুভূতি নেই মাহমুদ?

নেই।

মেয়েটির কথাও কি তুমি একটু ভাবছো না?

না।

তুমি কি পাথর দিয়ে তৈরি? এবার সত্যি সত্যি কেঁদে ফেললো রফিক।

হ্যাঁ আমি পাথর দিয়ে তৈরি। ছুটে সেখান থেকে বেরিয়ে এলো মাহমুদ।

ওর জল ছলছল চোখজোড়া আর সহ্য হচ্ছিলো না মাহমুদের।

বাসায় এসে লম্বা একটা ঘুম দিলো মাহমুদ। ঘুম যখন ভাঙলো দুপুর গড়িয়ে গেছে। কুয়োতলায় বসে অনেকক্ষণ ধরে গায়ে পানি ঢেলে স্নান করলো

সে। বাসায় এখন মা আর দুলু ছাড়া কেউ নেই। বাবা অফিসে, হাসিনা স্কুলে, খোকন মরিয়মের সঙ্গে গেছে। স্নান সেরে আসতে সালেহা বিবিও এলেন পিছু পিছু। মাহমুদ বুঝলো মা কিছু বলতে চান। চুলে চিরুনি বুলিয়ে নিয়ে সে তাকালো মায়ের দিকে—কিছু বলবে কি মা?

মা বললেন, মরিয়ম নেই, বাড়িটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

মাহমুদ কোন মন্তব্য করলো না দেখে ক্ষণকাল পরে আবার বললেন তিনি—তুই একটা বিয়ে কর মাহমুদ। এ কথাটা বলতেই বোধ হয় এসেছিলেন সালেহা বিবি।

মুদু হাসলো মাহমুদ।

হাসছিস কেন?

মা অবাক হয়ে বললেন, বয়স কি কম হয়েছে তোর?

মাহমুদ হাসি থামিয়ে বললো, বিয়ে করে আরেকটা ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কি মা?

ঝামেলা হতে যাবে কেন? মা জবাব দিলেন, বউ আনলে লক্ষ্মী আসবে ঘরে।

মাহমুদ ভ্রু বাঁকিয়ে বললো, খাওয়াবে কি?

সালেহা বিবি বললো, কেন আমরা কি উপোস থাকি?

অনেক জোড়াতালি দেয়া, মায়ের পরনের শাড়িটার দিকে চোখ নামিয়ে এনে আস্তে করে বললো, যেভাবে আমরা থাকি, সেভাবে মানুষ থাকে না মা! কি দরকার আরেকটা নিরীহ মেয়েকে অমানুষ বানিয়ে?

নিজের শতচ্ছিন্ন শাড়িটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলেন সালেহা বিবি।

আমেনার শাড়িটাও অজস্র ছেড়া আর তালিতে ভরা। সেও মা। তারও ছেলেমেয়ে আছে। স্বামী আছে। তবু সালেহা বিবির সঙ্গে কোথায় যেন একটা ব্যতিক্রম রয়েছে ওর। চৌকির এক কোণে বসে নীরবে আমেনাকে দেখছিলো আর ভাবছিলো মাহমুদ।

ঘরটা ঝাঁট দিয়ে, টুকিটাকি জিনিসপত্রগুলো গোছাচ্ছিলো আমেনা। মুখ তুলে বললো, প্রেস বিক্রি করে দেবে দাও। বারবার আমাকে জিজ্ঞেস করো কেন? আমি করবো না বললেই কি আর রেহাই পাওয়া যাবে।

কথাগুলো শাহাদাতকে উদ্দেশ্যে করে।

মাহমুদের মুখোমুখি একবার টুলের ওপর বসে ছিলো সে। নড়েচড়ে একবার মাহমুদ আরেকবার আমেনার দিকে তাকিয়ে সে বললো, তাই বলে তোমার বুঝি কোন মতামত থাকবে না?

আমেনার মতামত ছাড়া শাহাদাত কিছু করে না তা নয়। এ ক্ষেত্রে আমেনার মতামত চাওয়ার মধ্যে একটা সুগু ইচ্ছে লুকিয়ে রয়েছে, সেটা জানতো মাহমুদ। আমেনার বড় তিন ভাই বেশ রোজগার করছে ইদানীং। ধানমণ্ডিতে বাড়ি করেছে ওরা। গাড়িও কিনেছে একখানা। ছেলেমেয়ে নিয়ে ওরা বেশ সুখে আছে। আমেনা ইচ্ছে করলে এ দুঃসময়ে হাত পাততে পারে ওদের কাছে। রক্তের ভাই, সহজে না করবে না। প্রেসটাকেও তাহলে বিক্রির হাত থেকে বাচানো যাবে। কিন্তু, প্রস্তাবটা সরাসরি মুখ ফুটে বলতে ভয় পায় শাহাদাত। আমেনার স্বভাবটা ওর অজানা নয়। আমেনা কিছুক্ষণ পরে বললো, আমার মতামত আবার নতুন করে কি দিবো। চালাতে না পারলে বিক্রি করে দাও।

শাহাদাত বললো, তারপর চলবে কেমন করে?

আমেনা গম্ভীর হয়ে বললো, আর পাঁচজন যেমন করে চলে। বলে বাচ্চা ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে রান্না ঘরে চলে গেলো আমেনা।



এতক্ষণে মাহমুদ একটি কথাও বলে নি। সে ভেবেছিলো, মায়ের সঙ্গে আমেনার ব্যতিক্রম যেখানে-সেখানে ওর সঙ্গে রয়েছে একটা আশ্চর্য মিল। না তা নয়। আমেনাকে ওর নিজের চেয়ে বড় মনে হলো আজ।

শাহাদাত মৃদু গলায় বললো, দেখলে তো, কী যে স্বভাব পেয়েছে ও বুঝি না। দূরের কেউ তো নয়, আপন মায়ের পেটের ভাই, দরকার পড়েছে তাই হাত পাতবে। ভিক্ষে তো চাইছি না, ধার চাইছি। এতে অসম্মানের কি হলো?

মাহমুদ চুপ করে রইলো।

ওকে নীরব থাকতে দেখে শাহাদাত আবার বললো, আরে ভাই, ওদের হচ্ছে হারামীর টাকা। কন্ট্রাকটারী করে, রাস্তায় রাস্তায় রোজগার করছে। দিতে একটু গায়ে লাগবে না।

মাহমুদ আশ্তে করে বললো, ওই হারামী টাকাগুলো এনে তোমার অনেক শ্রমে গড়া প্রেসটাকে কলুষিত করো না শাহাদাত। তারচেয়ে বিক্রি করে দাও ওটা।

ওর কাছ থেকে কোন রকম সমর্থন না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়লো শাহাদাত। সবার ইচ্ছে প্রেসটা বিক্রি করে দেয়। কিন্তু বিক্রির কথা ভাবতে গিয়ে নিজের মন থেকে সত্যিকার কোন সাড়া পায় না সে। বুকটা ব্যথায় চিনচিন করে ওঠে। কত কষ্টে গড়া ওই প্রেস। বার কয়েক উসখুস করে ধরা গলায় হঠাৎ শাহাদাত বললো, তোমরা কি আমার কথা একবার ভাবো না? ওই প্রেসটার পেছনে সর্বস্ব দিয়েছি আমি, ওটাকে অন্যের হাতে তুলে দিয়ে কি করে বাঁচবো, বলো।

মাহমুদ নীরব।

পর পর কয়েকটা লম্বা শ্বাস নিলো শাহাদাত। তারপর অনেকক্ষণ অভিমানেভরা কণ্ঠে বললো, ঠিক আছে, তাই হবে বলে চুপ করে গেলো সে।

এ সময়ে আবার এ ঘরে এলো আমেনা। মরিয়মের বিয়ে প্রসঙ্গে মাহমুদকে দুচারটে প্রশ্ন করলো সে। কোথায় বিয়ে হয়েছে, ছেলে দেখতে শুনতে কেমন, কি করে। পানদানটা সামনে রেখে একটা পান বানিয়ে খেলো আমেনা। তারপর আবার চলে গেলো। অনেকক্ষণ পর মাহমুদ বললো, প্রেসটা বিক্রি করে দেবার পর কি করবে? চাকরি-বাকরি-!

কথাটা শেষ করতে পারলো না। শাহাদাত বাধা দিয়ে বললো, কি যে বলো তুমি? আমি চাকরি করবো? আমেনা তাহলে গলায় দড়ি দেবে। বলে হেসে উঠলো সে। হাসতে গিয়ে চিবুকে অনেকগুলো ভাঁজ পড়লো তার।

মাহমুদ কিছু বলবে ভাবছিলো।

আমেনা আবার এলো সেখানে-কী হলো অমন হাসছে যে। বলতে গিয়ে খুকখুক করে বার কয়েক কাশলো সে। আবার কাশলো।

শাহাদাত শঙ্কিত চোখে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, তোমার কাশটা দেখছি আরো বাড়লো।

আমেনা পরক্ষণে বললো, না কিছু না।

শাহাদাত বললো, কিছু না নয়, তুমি ভীষণ ঠাণ্ডা লাগাও আজকাল। এ কথার কোন জবাব দিলো না আমেনা। খানিকক্ষণ কেশে নিয়ে ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসলো সে।

ওদের এই দাম্পত্য আলাপের মাঝখানে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো মাহমুদ। কাল বিকেলে এতক্ষণে বর এসে গেছে মরিয়মের। আজ সে শ্বশুরবাড়ি। সঙ্গে খোকনও আছে। হাসিনা ফিরেছে স্কুল থেকে।

বাসায় এখন বাবা, মা, দুলু আর সে হয়তো বসে বসে বিয়ের গল্প করছে। কাল স্বামীসহ আবার ফিরে আসবে মরিয়ম। হাসিনার ঘরে ওদের থাকার বন্দোবস্ত করা হবে। হাসিনা থাকবে মায়ের সঙ্গে। আর বাবার জন্যে মাহমুদের

ঘরে একটা নতুন বিছানা পাতা হবে। মা হয়তো এতক্ষণে সে বিষয় নিয়ে আলাপ করছেন বাসায় সবার সঙ্গে। মাহমুদ উঠে দাঁড়ালো।

শাহাদাত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, ওকি উঠলে কেন?

মাহমুদ আস্তে করে বললো, না, এবার যাই।

যাবে আর কি বসো না।

না, আর বসবো না।

কোথায় যাবে? টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে লম্বা একটা হাই তুললো শাহাদাত।

মাহমুদ বললো, প্রেসে, দেখি কোন কাজ আছে কি না। শরীরটা আজ বড্ড ম্যাজম্যাজ করছে, তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে যাবো।

আমেনা পেছন থেকে শুধালো, মরিয়ম ফিরছে কখন?

মাহমুদ সংক্ষেপে বললো, কাল।

আমেনা বললো, আবার এসো তুমি, খাওয়ার দাওয়াত রইলো।

মাহমুদ আস্তে বললো, আসবো। তারপর শাহাদাতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় নেমে এলো সে।

দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে অবাক হলো মরিয়ম। বিয়ের পর তিনটে মাস কেটে গেছে। দিনগুলো যেন বাদাম তোলা নৌকোর মতো দেখতে না দেখতে চলে গেলো। প্রথম প্রথম মনসুর তো ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলো। সারাদিন ঘরে থাকতো। সারাক্ষণ মরিয়মের পাশে। মরিয়ম রাগ করে বলতো ব্যবসাটা কি ডোবাবে নাকি?

মনসুর বলতো, তোমার জন্যে ডোবে যদি ডুবুক। ক্ষতি নেই। রোজ বিকেলে সাজপোশাক পরে, চকোলেট রঙের গাড়িতে চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছে ওরা। যেখানে যেতে চেয়েছে মরিয়ম, সেখানে নিয়ে গেছে মনসুর।

মাঝে বারকয়েক বাবার বাড়িতেও এসেছিলো মরিয়ম। দিন দুতিনেক করে থেকে গেছে।

আরো থাকতো। মনসুরের পীড়াপীড়িতে থাকতে পারে নি।

নিজের স্বচ্ছল জীবনের পাশে বাবা মা-ভাইবোনের দীনতা মনে আঘাত দিয়েছে মরিয়মকে। যখন যা পেরেছে, টাকা-পয়সা দিয়ে ওদের সাহায্য করছে সে। মনসুর কথা দিয়েছে, একটা ভালো বাড়ি দেখে সেখানে নিয়ে আসবে ওদের। ভাড়াটাও নিজেই দেবে, আর হাসিনা ও খোকনের পড়ার খরচটা চালাবে মনসুর। শুনে প্রসন্ন হয়েছে মরিয়ম। মাবাবারও খুশির অন্ত নেই। যখন হাত পেতেছেন কিছু না কিছু পেয়েছেন মনসুরের কাছে। জীবনটা বেশ চলছিলো।

কিন্তু দুমাস না যেতে, অকস্মাৎ একদিন প্রথম জোয়ারের উচ্ছ্বাসে ভাটা এলো। খাওয়ার টেবিলে সেদিন বড় উন্মনা মনে হচ্ছিল মনসুরকে। শোবার ঘরে এসে প্রথম বললো, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ম্যারি, উত্তর দেবে?

শঙ্কিত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে মরিয়ম জবাব দিলো, কি কথা, বলো।

জাহেদ নামে কোন ছেলেকে তুমি চিনতে? ওর দৃষ্টি মরিয়মের চোখের উপর।

বুকটা বহুদিন পর কেঁপে উঠেছে মরিয়মের। ইতস্তত করে বললো, চিনতাম।

মনসুরের মুখখানা কাল হয়ে এলো। ক্ষণকাল পরে সে আবার বললো, তার সঙ্গে কি সম্পর্ক ছিলো তোমার?

মুখখানা মাটির দিকে নামিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো মরিয়ম। তারপর মুখ তুলে সরাসরি ওর দিকে তাকিয়ে বললো সে, ওকে আমি ভালবাসতাম বলতে গিয়ে একটা ঢোক গিললো মরিয়ম।

ভালবাসতে! যেন আত্ননাদ করে উঠল মনসুর।

মরিয়ম আস্তে করে বললো, হ্যাঁ। মাথার উপরের পাখাটা আরো জোরে ঘুরিয়ে দিয়ে মনসুর কাঁপা গলায় বললো, তারপর?

মরিয়মের দেহটা পাথরের মত নিশ্চল ঠাণ্ডা। অকম্পিত গলায় সে জবাব দিলো, তখন আমি স্কুলে পড়ি। বাবা হঠাৎ পড়া বন্ধ করে দিয়ে বিয়ে ঠিক করে ফেললেন আমার। জাহেদকে আমি ভালবাসতাম। আমাদের পাড়াতেই সে থাকতো। কলেজে পড়তো। সেও ভালবাসতো আমায়। মরিয়ম থামলো, থেমে বার কয়েক ঘন ঘন শ্বাস নিলো সে। তারপর আবার বললো, বাবা যখন কিছুতেই বিয়ের আয়োজন বন্ধ করলেন না তখন একদিন রাতে ওর সঙ্গে পালিয়ে গেলাম আমি।

পালিয়ে গেলে! দ্বিতীয়বার আত্ননাদ করে উঠলো মনসুর।

মরিয়ম অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে। ঢাকা থেকে পালিয়ে চিটাগাং চলে গেলাম আমরা। জাহেদ তার মায়ের কিছু অলঙ্কার আর নগদ টাকা সঙ্গে নিয়েছিল। কথা হয়েছিল চাটগাঁ গিয়ে একটা বাসা ভাড়া নেবো আমরা। জাহেদ একটা চাকরি জোগাড় করবে। মরিয়ম থামলো।

টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখা জগ থেকে এক গ্লাস পানি খেয়ে এসে আবার বললো মনসুর-তারপর?

পাখার বাতাসে কালো চুলগুলো বারবার উড়ে উড়ে পড়ছিলো মরিয়মের ফর্সা মুখের ওপর। আস্তে করে সে আবার বললো, ওখানে গিয়ে বাসা পাওয়া গেলো না, একটা সস্তা হোটেলে একখানা রুম ভাড়া করেছিলাম আমরা।

একসঙ্গে ছিলে? ওর মুখের দিকে তাকাতে সাহস হলো না মনসুরের।  
মরিয়ম হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে

জবাব দিলো, হ্যাঁ।

তারপর?

পাখার নিচে ঘামতে শুরু করেছে মনসুর।

তারপর সেখানে দু-মাস ছিলাম আমরা-মরিয়ম মৃদু গলায় বললো, টাকা পয়সা সব ফুরিয়ে গিয়েছিলো, ভীষণ কষ্টে দিন কাটছিলো আমাদের। তারপর একদিন-বলতে গিয়ে ইতস্তত করলো মরিয়ম, তারপর একদিন আমাকে সেখানে একা ফেলে রেখে কোথায় যেন চলে গেলো জাহেদ, আর ফিরলো না। বলতে গিয়ে এতক্ষণে চোখজোড়া পানিতে টলমল করে উঠলো তার।

মরিয়মের কথা শেষ হয়ে গেলে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো ওরা। পাখাটা ঘুরছে মাথার উপর। ঘরের মধ্যে শুধু তার বনবন শব্দ। কারো দিকে কেউ তাকালো না ওরা। কি এক নির্বিকার নীরবতায় দুজনে ডুবে গেলো। পরস্পরের কাছাকাছি অস্তিত্বটা ধীরে ধীরে যেন দূরে সরে গেলো। মরিয়মের মনে হলো, অনেকক্ষণ পরে, বহুদূর থেকে যেন মনসুর জিজ্ঞেস করছে তাকে, জাহেদকে সত্যি ভালবাসতে তুমি?

মরিয়ম মাথা নোয়ালো-হ্যাঁ।

এখনো ভালবাস? দ্বিতীয় প্রশ্ন।

মরিয়ম মাথা নাড়লো-না।

মনসুরের মনে হলো মিথ্যে কথা বলছে মেয়েটা।

সে রাতে আর কোন কথা হলো না।

মরিয়ম লক্ষ্য করেছে, সারারাত ঘুমোতে পারে নি লোকটা।

পরদিন সকালে, মাঝে মাঝে তাল ভঙ্গ হয়ে গেলেও আগের মত ব্যবহার করলো মনসুর। বাইরে বেরুবার সময় রোজকার মত দুহাতে ওকে আলিঙ্গন করে মৃদু গলায় বললো, কাজটা সেরে আসি, কেমন? মরিয়ম ওর মুখের কাছে মুখ এনে মিষ্টি হেসে বললো, এসো।

কিন্তু দুপুরে আবার যখন ফিরে এলো মনসুর, তার মুখখানা তখন আবার ভার হয়ে গেছে। সারা মুখে চিন্তার ছায়া। বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলো সে। খাওয়ার পরে, বিছানায় বিশ্রাম নেবার সময় বার কয়েক এপাশ ওপাশ করে

হঠাৎ সে উঠে বসে বললো, তুমি আমাকে ভালবাস মরিয়ম? গলাটা অদ্ভুত শোনালো ওর।

মরিয়ম পাশে বসেছিলো। চমকে তাকালো ওর দিকে। মৃদু হেসে জবাব দিলো, কেন, তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে?

মনসুর মৃদু গলায় বললো, না। ক্ষণকাল চুপ থেকে আবার প্রশ্ন করলো, তুমি জাহেদকেও ভালবাসতে, তাই না? তার কণ্ঠস্বরে অস্থিরতা।

মরিয়ম দৃষ্টিটা ওর ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে বললো, হ্যাঁ।

অন্যদিন এ সময়ে বেরুতো না মনসুর, সেদিন বেরিয়ে গেলো। যাবার সময় মরিয়ম জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাচ্ছে?

মনসুর ইতস্তত করে দু-হাতে কাছে টেনে নিলো ওকে। তারপর বললো, কাজ আছে।

বিকলে সে ফিরলো না, ফিরলো সে অনেক রাত করে। কাপড় চোপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়।

মরিয়ম জিজ্ঞেস করলো, খাবে না?

সে বললো, মাথা ধরেছে, কিছু ভালো লাগছে না আমার।

কপালটা টিপে দেবো?

না।

সারারাত যন্ত্রণায় ছটফট করেছে মনসুর।

পরদিন চায়ের টেবিলে হঠাৎ সে প্রশ্ন করলো, সত্যি করে বলতো ম্যারি, তুমি কাকে বেশি ভালবেসেছ? জাহেদকে না আমাকে?

চায়ের কাপটা মুখের কাছে এনে নামিয়ে রাখলো মরিয়ম। এক ঝলক চা ঢলকে পড়ে গেলো পিরিচের ওপর, মৃদু স্বরে সে জবাব দিলো, জানি না।

ব্রজোড়া অদ্ভুতভাবে বাকালো মনসুর। তারপর আস্তে করে বললো,  
তোমার কি মনে হয়, মানুষ দুবার প্রেমে পড়তে পারে?

বিরত মরিয়ম বললো, পারে।

বাজে কথা। চায়ের কাপটা সামনে ঠেলে দিয়ে উঠে পড়লো মনসুর।  
লম্বা সোফাটার উপর শুয়ে পড়ে দুহাতে কপালটা চেপে ধরলো সে। আবার মাথা  
ধরেছে।

সেদিন বিকেলে লিলি এলো বাসায়।

ভাই আর ভাবীর সঙ্গে ঝগড়া করে বাসা ছেড়ে দিয়েছে সে। শঙ্করটোলা  
লেনে একটা ঘর নিয়ে থাকবে বলে সে কথা মরিয়মকে জানাতে এসেছিলো  
লিলি। ওর ম্লান মুখ দেখে অবাক হলো সে। বললো, তোমার কি অসুখ করেছিলো  
ম্যারি?

কই না তো। মরিয়ম ঘাড় নাড়লো।

লিলি বললো, তুমি ভীষণ শুকিয়ে গেছ।

মরিয়ম হাসতে চেষ্টা করলো, তাই নাকি?

লিলি বললো, হ্যাঁ।

সেদিন অনেকক্ষণ দুজনে গল্প করেছিলো ওরা। বাইরে ছোট লনটিতে  
দুটো বেতের চেয়ার বের করে মুখোমুখি বসেছিলো।

লিলি বললো, হাসিনা এসেছিলো?

মরিয়ম বললো, মাঝখানে দিন চারেক সে থেকে গেছে এখানে, তারপর  
আর আসে নি।

বাবা এসেছিলেন একদিন। খোকন আসে মাঝে মাঝে।

তোমার দাদা?

না। বলতে গিয়ে একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস পড়লো তার। মাহমুদ যে আসবে  
না সেটা জানতো মরিয়ম।



ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিলো। আকাশে তারারা জ্বলে উঠেছিলো একে একে। স্নিগ্ধ বাতাস বইছে সবুজ লনের উপর দিয়ে। অন্ধকারে ওরা দুজনে বসে। মরিয়ম ভেবেছিলো লিলিকে কিছু বলবে না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে আর সংবরণ করে রাখতে পারলো না সে। দিন কয়েক ধরে যা ঘটেছে সব খুলে বললো লিলিকে।

শুনে লিলি মন্তব্য করলো, তুমি এতো বোকা তাতো জানতাম না ম্যারি।  
মরিয়ম শুধালো কেন।

লিলি বললো, সব কিছু ওভাবে খুলে বলতে গেলে কেন ওকে?

মরিয়ম বললো, মিথ্যে তো বলি নি।

লিলি হাসলো, অত সত্যবাদী হতে নেই ম্যারি। এ সমাজে বাঁচতে হলে মিথ্যের মুখোশ পরে চলতে হয়।

মরিয়ম অবাক হয়ে বললো, কেন?

কেন তা টের পাবে ধীরে। জবাব দিলো লিলি।

ক্ষণকাল চুপ থেকে মরিয়ম বললো, মানুষ কি দুবার প্রেমে পড়তে পারে না? একজনকে হারিয়ে সেকি আরেকজনকে ভালবাসতে পারে না?

পারে। দুবার কেন দশবারও পারে। লিলি বললো, কিন্তু সেটা কেউ স্বীকার করে না। যেমন আমার কথাই বল না। তুমি তো জান, দুটি ছেলেকে ভালোবাসছিলাম আমি। একজন ছিলো খুব ভালো অভিনেতা, আরেকজন ছিলো গায়ক। সেসব অতীতের কথা, তাই বলে ভবিষ্যতে আমি কাউকে ভালবাসবো না, তাতো নয়। হয়তো ভালবাসবো, কিন্তু ওদের কারো কথা আমি বলবো না তাকে।

অন্ধকারে শব্দ করে হেসে দিলো মরিয়ম।

লিলি বললো, তুমি হাসছে ম্যারি। বড় সরল মেয়ে তুমি। এ সমাজের কিছুই জান না।

অনেক রাত হয়ে গেছে বলে উঠে পড়লো লিলি। একদিন তার নতুন ঘরটায় গিয়ে দেখে আসতে অনুরোধ করলো। মরিয়ম খেয়ে যাওয়ার জন্যে ধরেছিলো। লিলি জানালো, অন্য আরেকদিন এসে খাবে সে, আজ নয়।

কয়েকদিন পরে, সেটা হয় রোববার ছিলো। বারান্দায় বসেছিলো ওরা। মরিয়ম একটা বই পড়ছিলো আর মনসুর সেদিন ডাকে-আসা কয়েকখানা চিঠি দেখছিলো বসে বসে। চিঠিগুলো পড়া শেষ হলে সে বললো, আচ্ছা মরিয়ম-। মরিয়ম চোখ তুলে তাকালো।

জাহেদের ব্যাপারে তুমি আমাকে আগে বল নি কেন?

তুমি জিজ্ঞেস করো নি বলে। আবার বই-এর মধ্যে মুখ নামালো মরিয়ম।

আবার মনসুরের গলা- লুকোও নি তো?

মরিয়ম চমকে উঠলো। বইটা বন্ধ করে রেখে সোজা ওর চোখের ওপর দৃষ্টি ফেললো সে। তারপর মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলো, তোমার কি হয়েছে বলতো?

না, কিছু না। চিঠিগুলো হাতে নিয়ে ভেতরে চলে গেলো মনসুর। একটা তীব্র দৃষ্টি হেনে গেলো যাবার সময়। দুহাতে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেললো মরিয়ম।

বিয়ের তিনটি মাসের শেষ মাসটি এমনি করে কেটেছে তার। ক্যালেন্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে মরিয়ম ভাবছিলো দিনগুলো কেমন করে এত তাড়াতাড়ি কেটে গেলো।

আয়ার ডাকে চমক ভাঙলো তার। আপনার ভাই এসেছে গো, দেখুন। মরিয়ম তাকিয়ে দেখলো, দোরগোড়ায় খোকন দাঁড়িয়ে।

ছুটে এসে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলো সে। চিবুক ধরে আদর করলো তাকে-কিরে খোকন, স্কুলে যাসনি আজ?

খোকন বললো, না। স্কুল ছুটি হয়ে গেছে।

মরিয়ম বললো, মা কেমন আছেন?

প্যান্টের পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে মরিয়মের হাতে দিলো খোকন। বললো, মা দিয়েছে এটা।

মরিয়ম খুলে দেখলো হাসিনার হাতের লেখা। দশটা টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে মা।

বড় দরকার।

চিঠিটা পড়ে ব্লাউজের মধ্যে রেখে দিলো সে।

দুপুরে খেয়ে যাবে তুমি, এখন বসো। তোমার দুলাভাই আসুন, তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে দেবো।

বসে বসে খোকন অনেকক্ষণ এটা-সেটা জিজ্ঞেস করলো মরিয়মকে।  
দুলু কি তার কথা বলে? হাসিনা কেমন আছে? আর ভাইয়া? বাবার শরীর ভালতো? তসলিম কি এখনো হাসিনাকে ছবি তোলা শেখায়? কাল রাতে কি রান্না হয়েছিলো ওদের? সকালে কি নাস্তা করেছে সে?

খোকনকে কাছে পেয়ে বড় ভালো লাগছিলো মরিয়মের।

দুপুরে মনসুর ফিরে এলে বললো, দশটা টাকা দিতে পারে?

মনসুর ঙ্গ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, কেন বলতো?

মরিয়ম কোন জবাব দেবার আগেই খোকনের দিকে চোখ পড়লো তার।  
ওর দিকে এক পলক তাকিয়ে সে আবার বললো, তোমার বাপের বাড়ি থেকে টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে বুঝি?

ওর কথা বলার ধরন দেখে ক্ষুণ্ণ হলো মরিয়ম। ইতস্তত করে বললো,  
ধার চেয়েছেন, মাস এলে শোধ করে দেবেন।

ওসব ন্যাকামো করো কেন বলতো, মনসুরের কণ্ঠে উন্মাদ। এ তিন মাসে  
কম টাকা নেয় নি ওরা, এক পয়সা শোধ দিয়েছে? ব

লতে বলতে পকেট থেকে ব্যাগটা হাতে নিয়ে একখানা দশ টাকার নোট বের করলো সে। তারপর নোটখানা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে আবার বললো, দশ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে বললেই তো হয়-নাও। তার কণ্ঠে তাচ্ছিল্যের সুর। নোটখানা হাত থেকে উড়ে মাটিতে পড়ে গেলো। মরিয়ম পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর উপুড় হয়ে ওটা তুলে নিলো হাতে।

খোকনকে বিদায় দেবার সময়, কাছে টেনে আদর করলো মরিয়ম। তারপর কানে কানে বলে দিলো মাকে কিছু বলো না কেমন? আবার এলে টফি দেবো তোমায়।

খোকন মাথা নেড়ে সাই দিলো।

এতক্ষণ কিছু বলার জন্যে উসখুস করছিলো মনসুর ও চলে যেতে বললো তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, উত্তর দেবে? ঈষৎ লাল চোখজোড়া মেলে তাকালো সে।

ছড়ানো চুলগুলো খোঁপায় বন্ধ করতে করতে মরিয়ম বললো, বলো।

মনসুর চিন্তা করছিলো বলবে কিনা। অবশেষে বললো, তুমি কি আমায় সত্যি ভালবেসেছিলে না আমার টাকার প্রতিই আকর্ষণ ছিলো তোমার?

চোখজোড়া বড় বড় করে ওর দিকে তাকালো মরিয়ম। তারপর ডুকরে কেঁদে উঠলো সে। আমরা গরীব বলে আজ এত বড় কথা বলতে পারলে তুমি। এত অবিশ্বাস যদি মনে ছিলো তবে বিয়ে করলে কেন?

তখন কি আমি জানতাম যে তোমার ওই দেহটা তুমি আরেকজন পুরুষের হাতে তুলে দিয়েছিলে? তিক্ত গলায় ফেটে পড়লো মনসুর-সে লোকটা সারা দেহে চুমো দিয়েছে তোমার, রান্সসের মত ভোগ করেছে, আর তুমি দু-হাতে তাকে আলিঙ্গন করেছো, গভীর তৃপ্তিতে তার বুকে মুখ গুঁজেছ, ভাবতে ঘিন্মা লাগে, বমি আসে আমার, একটুকাল দম নিয়ে সে আবার বললো, আমি

তোমাকে কুমারী বলে জানতাম আর আমার সরলতার সুযোগ নিয়ে আমাকে তুমি ঠকিয়েছ।

উহ আর না; আর বলো না, দোহাই তোমার এবার থামো। আর সহ্য হচ্ছে না আমার। সারা দেহটা কান্নায় দুলছিলো মরিয়মের। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে দুহাতে মুখখানা ঢেকে রাখলে সে। খোপাবদ্ধ চুলগুলো সারা পিঠে ছড়িয়ে পড়লো কালো হয়ে। মনুসর তখনো হাঁপাচ্ছে।

আজ দুপুরে আমেনারা চলে যাবে। অনেক করে বলে গেছে শাহাদাত-কাল সময় করে একবার এসো, এইতো শেষ দিন তোমাদের শহরে। এসো কিন্তু।

প্রেসটা বিক্রি করে দিয়েছে ওরা। ভৈরবে একটা স্টেশনারী দোকান কিনেছে। প্রেসের মালিক অবশেষে স্টেশনারী দোকানের মালিক হতে চললো।

কাউন্টারে বসে-বসে জিনিসপত্র বিক্রি করবে শাহাদাত। তবু কারো চাকরি সে করবে না। আমেনা চায় না তার স্বামী কারো গোলামী করুক।

শুনে মাহমুদ বলেছিলো, দোকান দিয়েছো ভালো কথা। কিন্তু ভৈরবে কেন? ঢাকায় কিনতে পারলে না?

পেলে নিশ্চয় কিনতাম। জবাবে বলেছে শাহাদাত-ওখানে সস্তায় পাওয়া গেলো তাই।

কথাটা যে সত্য নয় সেটা বুঝতে বিলম্ব হয় নি মাহমুদের, ভৈরবে দোকান কেনার পেছনেও রয়েছে আমেনার অদৃশ্য ইংগিত। সে চায় না তাদের এই ক্ষয়ে ক্ষয়ে তলিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা সকলে দেখুক, উপভোগ করুক, বিশেষ করে তার ভাইয়েরা আর তাদের পরিচিত বন্ধুবান্ধবেরা। ওদের চোখের কাছ থেকে নিজের দীনতটুকু আড়াল করে রাখতে চায় আমেনা। ভৈরবে পরিচিত কেউ নেই। সেখানকার সকলে নতুন পরিচয়ে জানবে তাকে, জানবে দোকানীর বউ বলে।

এককালে সে প্রেস মালিকের বউ ছিলো আর তার ভাইয়েরা এখনো ঢাকার রাস্তায় মোটর হাকিয়ে বেড়ায়—এ খোঁজ কাউকে দেবে না আমেনা।

মাহমুদ এসে দেখলো জিনিসপত্রগুলো সব ইতিমধ্যে বেঁধে-ছেঁদে নিয়েছে ওরা। একটা পুরানো ট্রান্স, দুটো সুটকেস, একটা চামড়ার, আরেকটা টিনের। তিনটে বস্তার মধ্যে টুকিটাকি মাল। কাঠের আসবাবপত্রগুলো পাড়ার একজনের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে শাহাদাত। ওগুলো সঙ্গে নেয়া যাবে না। পথে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। ভৈরব গিয়ে, মিস্ত্রি দিয়ে নতুন করে আবার বানিয়ে নিতে হবে সব।

শাহাদাত বসে বসে একটা বস্তার মুখ সেলাই করছিলো।

আমেনা আগিনায় ছেলেমেয়েদের গোসল कराচ্ছে।

মাহমুদ বললো, আমার আসতে দেরি হয়ে গেলো, তোমরা তৈরি হয়ে আছো দেখছি।

শাহাদাত মুখ তুলে মৃদু হাসলো। হেসে বললো, বসো। একটু পরে ঠেলাগাড়িওয়ালা আসবে। ট্রেনেরও বোধ হয় সময় হয়ে এলো।

মাহমুদ বসলো।

গত সাত বছর ধরে এখানে আছে ওরা, এই বাসাতে।

আজ ছেড়ে চলে যাবে।

তারপর এ পথে হয়তো আর আসবে না মাহমুদ। এলে ওদের বাসাটার দিকে চোখ পড়লে নিশ্চয় ভীষণ খারাপ লাগবে ওর।

মিছামিছি তুমি দোকান দিচ্ছ শাহাদাত। মাহমুদ এক সময়ে বললো, একদিন সেটাও বিক্রি করে দিতে হবে।

কেন, কেন? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো শাহাদাত।

মাহমুদ বললো, সেখানেও সবাইকে ধারে জিনিসপত্র দিতে শুরু করবে তুমি। তারপর যখন কেউ আর ধার শোধ করতে চাইবে না, তখন দেখবে দোকান শূন্য। মাল নাই।

উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিলো শাহাদাত।

আমেনা এলো ভেতরে।

মাহমুদ বললো, ওর মধ্যে অনেক পরিবর্তন তুমি এনেছো আমেনা, আর এই বিশী স্বভাবটা বদলাতে পারলে না।

কি, কোন স্বভাবের কথা বলছো? আমেনার দুচোখে কৌতুক।

মাহমুদ বললো, লোককে ও বিশ্বাস করে। বড় বেশি ধার দেয়।

আমেনা কোন উত্তর দেবার আগে শব্দ করে হেসে উঠলো শাহাদাত। বস্তার মুখটা ভালোভাবে বন্ধ করে দিয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে বললো, কার কাছে অভিযোগ করছে মাহমুদ। এ স্বভাবটা আমার ওর কাছে পাওয়া।

আমেনা ততক্ষণে আবার বাইরে বেরিয়ে গেছে।

মাহমুদ ধীরে ধীরে বললো, স্বভাবটা যারই হোক, নিশ্চয় এটা খুব ভালো স্বভাব নয়। দুনিয়াটা হলো কতগুলো স্বার্থপরের আড্ডাখানা। অন্যকে দিয়ে নিঃশেষ হয়ে যেতে পার তুমি কিন্তু প্রয়োজনে কারো কাছ থেকে একটা কানাকড়িও পাবে না।

ম্লান হাসলো শাহাদাত। তারপর গম্ভীর হয়ে বললো, তোমার উজ্জ্বল সত্যতা নিয়ে আমি তর্ক করতে চাইনে মাহমুদ। দুনিয়াটা কতকগুলো স্বার্থপরের আড্ডাখানা একথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে আমি রাজী নই। আজ এই বিদায়ের মুহূর্তে আর পাঁচটা কাজ ফেলে তুমি যে এখানে এসেছে, এর পেছনে কোন স্বার্থ আছে বলতে চাও? নেই, জানি। জানি বলেই তো এখনো বেঁচে আছি। নইলে— বলতে গিয়ে থেমে গেলো শাহাদাত। গলাটা ধরে এসেছে ওর। চোখের কোণে দুফোটা জল মুক্তোর মত চিকচিক করছে।

বিরত মাহমুদ, বড় ট্রাক্টর দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলো।

স্টেশনে এসে ট্রেন ছাড়বার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত মাহমুদের হাত ধরে শাহাদাত বললো, চিঠিপত্র লিখো মাহমুদ, আর যদি পারো একবার গিয়ে বেড়িয়ে এসো।

মাহমুদ কিছু বলতে পারলো না। মাথা নেড়ে সাই দিলো শুধু। জানালার ধারে বসে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে আমেনা। পাশে তার ছেলেমেয়েরা। পান খেয়ে ঠোঁট জোড়া লাল করেছে সে। কালো ছোট্ট একটা টিপ। গাড়ির আঁচলখানা খোঁপা পর্যন্ত তোলা। আজ হঠাৎ সুন্দর করে সেজেছে আমেনা।

সামনে এগিয়ে গিয়ে মাহমুদ বললো, আবার দেখা হবে আমেনা।

আমেনা লাল ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে বললো, একবার বেড়াতে এসো কিন্তু, নেমন্তন্ন রইলো।

মাহমুদ আস্তে করে বললো, আসবো।

একটু পরে ট্রেন ছেড়ে দিলো। ওদের মুখগুলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো চোখের আড়ালে।

একটা কনট্রাক্টরের সঙ্গে কাজে লেগে গেছে রফিক।

সকাল থেকে সন্ধ্যা মজুরদের সঙ্গে বসে বসে ওদের কাজ তদারক করা। কতদূর কাজ হলো দেখা। হিসেব নেয়া। আর কেউ কাজ না করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে তাকে ধমকিয়ে কাজ আদায় করা।

খোদাবক্স বলেছিলো, ওর ইচ্ছে ছিলো—লেখাপড়া-জানা মানুষ, লেখাপড়ার চাকরি করবে। তা বেকার বসে থাকার চেয়ে এটাও মন্দ কিসের, কি বলেন মাহমুদ সাহেব?



মাহমুদ সায় দিয়ে বললো, হ্যাঁ, অফিসের কেরানীগিরি করার চেয়ে এ চাকরি ঢের ভালো।

তারপর থেকে বেশ ক-দিন আর রফিকের দেখা পাওয়া যায় নি। সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকে ও। রাস্তা মেরামতের কাজ চলছে এখন। আজ বিশ্রামাগারে আসার পথে ওর কথা ভাবছিলো মাহমুদ। হয়তো ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। দেখা হলে বিয়ের কতদূর কি করলো জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু বিশ্রামাগার পর্যন্ত আসতে হলো না। পথেই দেখা হয়ে গেলো, গায়ে আধ ময়লা একটা জামা, পরনে এর চেয়েও ময়লা একটা পায়জামা! পায়ে টায়ারের স্যাভেল। কাজ শেষে ফিরছে সে।

দেখা হতে একগাল হেসে বললো, মনে মনে তোমার কথাই ভাবছিলাম মাহমুদ।

আমার কথা তুমি ইদানীং বড় বেশি ভাবছো। মাহমুদ জবাব দিলো পরস্পরে।

পথ চলতে চলতে রফিক আবার বললো, তুমি ইচ্ছে করলে আমার একটা ভালো চাকরি নিয়ে দিতে পারতে মাহমুদ। যাকগে, চাকরি একটা জুটিয়েছি। মন্দ না, ভালোই।

টেলিগ্রামের তারে বসে একটা কাক কা-কা শব্দে ডাকছে একটানা। সেদিকে তাকিয়ে থেকে মাহমুদ বললো, তুমি চাকরি চেয়েছিলে, একটা পেয়েছো আবার কি?

রফিক বললো, এবার ওকে বিয়ে করে ঘর বাঁধবো আমি। তোমরা দেখো, আমি খুব সুখী হবো। বলতে গিয়ে মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার। হঠাৎ সে প্রশ্ন করলো, তুমি বিয়ে করছে না কেন মাহমুদ?

চলার পথে হোঁচট খেলো মাহমুদ, হঠাৎ আমার সম্পর্কটি ভাবতে শুরু করছে কেন? নিজের কথা ভাবো।

রফিক চুপসে গেলো।

খানিকক্ষণ নীরবে পথ হাঁটলো ওরা।

নীরবতা ভেঙ্গে রফিক সহসা বললো, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিলো আমার।

বলো। এবার তুমি আমায় হতাশ করবে না, কথা দাও।

অমন কথা আমি দেই নে। মাহমুদের গলা বিরজিতে ভরা।

রফিক বললো, তাহলে আর কি লাভ।

মাহমুদ বললো, না বলাই ভালো।

কিন্তু না বলে কতে পারলো না রফিক। না বলার অনেক চেষ্টা করলেও অবশেষে বলতে হলো—শোনো মাহমুদ, মেয়েদের স্কুলের লিলি মাস্টারনির সঙ্গে শুনেছি তোমার নাকি বেশ আলাপ আছে।

কার কাছ থেকে শুনেছো? ওর কথাটা শেষ হবার আগেই গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলো মাহমুদ।

রফিক ইতস্তত করে বললো, কেন সবাই জানে। খোদাবক্স বলেছিলো সেদিন বিকেলে মেয়েটা নাকি স্কুল থেকে বেরিয়ে ওখানে খোঁজ করছিলো তোমায়।

বাজে কথা, একেবারে মিথ্যে কথা। মাহমুদ উত্তেজিত গলায় বললো, খোদাবক্স বানিয়ে বলেছে তোমাদের।

তা না হয় বলেছে। কপালের ঘাম মুছে নিয়ে রফিক আবার বললো, কিন্তু মেয়েটার সঙ্গে যে তোমার আলাপ আছে, তা কি সত্যি নয়?

মাহমুদ বললো, হ্যাঁ, সত্যি, কিন্তু তোমার সেটা নিয়ে এতো মাথা ঘামানো কেন?

আছে বন্ধু, আছে, নইলে কি আর মিছিমিছি মাথা ঘামাচ্ছি? রফিক হেসে দিয়ে বললো। ভাই এবার আমার কথাটা রাখ, ভালই হবে তোমার। আজ ক’দিন ধরে ওর সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। আগে দাইগুলোর হাতে হাতে চিঠি পাঠাতাম। এই দাইগুলো, বুঝলে, এক নম্বরের বজ্জাত। একটা চিঠির জন্যে দুটো করে টাকা নিতো। সেও ভালো ছিলো, এখন নেয়াই বন্ধ করে দিয়েছে, বলে ‘ডর লাগতী, নোকরি চলি যায়গী।’

মাহমুদ বাধা দিয়ে বললো, ওসব শুনে কি হবে আমার। আমার কিছু করার থাকলে তাই বলো।

তাইতো বলছি মাহমুদ। তুমি বন্ধু, বন্ধুর দুঃখ বুঝবে। সলজ্জ সঙ্কোচের সঙ্গে বললো, তোমার সেই লিলি মাস্টারনির হাতে যদি আমাদের চিঠিগুলো—কথাটা শেষ করতে পারলো না রফিক। মাহমুদের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলো সে। কে যেন আলকাতরা লেপে দিয়েছে ওর চোখেমুখে। একটু পরে মৃদু গলায় সে বললো, ওইসব ইয়ার্কি আমার ভালো লাগে না, বুঝলে?

রফিক কাতর গলায় বললো, তোমার কি আমার জন্যে অতটুকু অনুভূতি নেই মাহমুদ?

মাহমুদ জবাব দিলো, না।

রফিক বললো, এই বুঝি তোমার বন্ধুত্ব?

মাহমুদ বললো, হ্যাঁ। ততক্ষণে ওরা বিশ্রামাগারের চৌকাঠে এসে পা রেখেছে।

আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামবার আগে, শঙ্করটোলা লেনে লিলির নতুন বাসাটা খুঁজে বের করলো মরিয়ম। ওকে বাসায় পাওয়া যাবে কিনা ভাবছিলো সে। এসে দেখলো সবে বাইরে থেকে ফিরেছে লিলি। মুখ-হাত ধুয়ে, স্টোভে

আগুন জ্বালাচ্ছে। ওকে দেখে, কেতলিতে আরেক কাপ আন্দাজ পানি ঢেলে স্টোভের ওপর চড়িয়ে দিলো লিলি।

বাইরে তখন বৃষ্টি নেমেছে।

লিলি বললো, ঠিক সময়ে এসে পৌঁছে গেলে তুমি, নইলে ভিজতে হতো। মরিয়ম বললো, আরো আগে এসে পৌঁছতাম, তোমার ঠিকানাটা খুঁজে বের করতে দেরি হয়ে গেছে।

তাকের উপর থেকে চায়ের কৌটোটা নামিয়ে নিয়ে লিলি বললো, এই একটু আগে তোমার কথা ভাবছিলাম আমি। ভাবছিলাম কাল সকালে তোমার ওখানে যাবো। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে লিলি আবার বললো, আজ দুপুরে দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো রাস্তায়।

তাই নাকি? অন্যমনস্ক গলায় বললো মরিয়ম।

লিলি বললো, হ্যাঁ। তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন তিনি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জ্বলন্ত স্টোভটার দিকে তাকিয়ে রইলো মরিয়ম। কেটলির ঢাকনাটা তুলে এক মুঠো চায়ের পাতা ঢেলে দিয়ে লিলি আবার বললো, তোমার কি খবর?

সহসা কোন জবাব দিলো না মরিয়ম।

লিলি উঠে দাঁড়িয়ে সন্নেহে একখানা হাত রাখলো ওর কাঁধের ওপর-ও কি এখনো আগের মত ব্যবহার করছে?

তবু কিছু বললো না মরিয়ম। ডাগর চোখজোড়া ধীরেধীরে জলে ভরে এলো তার। কান্না চেপে মৃদু গলায় বললো, আগের মত হলে ভালোই ছিলো লিলি। আজকাল সে কি আর মানুষ আছে, অমানুষ হয়ে গেছে। বলতে গিয়ে চোখ উপচে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো তার।

ওকি, কাঁদছো কেন? হাত ধরে বিছানায় এনে ওকে বসালো লিলি। কেঁদে কি হবে।

জানি কেঁদে কিছু হবে না। মরিয়ম ধীরে ধীরে বললো, জীবনটা আমার এমন হলো কেন লিলি? এমনটি হোক, তাতো আমি চাই নি কোনদিন।

নিজহাতে তুমি নিজের সুখ নষ্ট করেছো ম্যারি। কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলো লিলি।

মরিয়ম নীরবে মাটির দিকে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, গত দুদিন সে বাসায় আসে নি। ওর কণ্ঠস্বরে ক্লান্তি আর হতাশা।

লিলি ওর মুখের দিকে চেয়ে শুধালো, একেবারেই আসে নি?

মরিয়ম সংক্ষেপে বললো না। স্টোভের ওপর থেকে কেটলি নামিয়ে আগুনটা নিভিয়ে দিলো লিলি। তারপর তাকের ওপর থেকে দুটো চায়ের পেয়ালা আর চিনির কৌটোটা মেঝেতে নাবিয়ে রাখলো সে।

মরিয়ম বললো, আমি চা খাবো না লিলি।

লিলি অবাক হয়ে শুধালো, কেন?

খানিকক্ষণ কি যেন ভাবলো মরিয়ম। তারপর মান গলায় বললো, আজ দু-দিন সে বাসায় আসে নি। তুমি কি ভাবছো এ দু-দিন কিছু মুখে দিতে পেরেছি আমি? বলতে গিয়ে কান্নায় গলাটা ভেঙ্গে এলো তার।

লিলি কী বলে ওকে সান্ত্বনা দেবে ভেবে পেলো না। পাশে এসে বসে বিব্রত গলায় বললো, ওর জন্যে নিজেকে এমন করে কষ্ট দিচ্ছে কেন ম্যারি?

মরিয়ম কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে লিলির কোলে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ কাঁদলো। জড়ানো স্বরে বললো, আমি কি পাপ করেছিলাম বলতে পারো লিলি? বলতে পারো আমার কপালটা এমন হলো কেন?

কেটলিটা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। ওর কারো চা খাওয়া হলো না।

বাসায় ফেরার কিছুক্ষণ পরেই, দোরগোড়ায় মনসুরের পায়ের শব্দে চমকে উঠলো মরিয়ম। আনন্দ ও আতঙ্ক দুটোই এসে এক সঙ্গে জড়িয়ে ধরলো তাকে।

ওকে দেখে মনসুর বিস্ময়ের ভান করলো, তুমি এখনো আছো? অদ্ভুত ভাবে ঝুজোড়া বাঁকালো সে।

না থাকলেই কি তুমি খুশি হতে? গলাটা কাঁপছিলো মরিয়মের। ঘরের মাঝখানে টিপয়টার চারপাশে সাজানো সোফার উপর বসে অকম্পিত স্বরে মনসুর জবাব দিলো, এ সহজ কথাটা কি আর বোঝ না তুমি?

ওর প্রতিটি কথা তীরের ফলার মত এসে বিঁধলো তার বুকে। ওর মুখের উপর থেকে জোর করে দৃষ্টি সরিয়ে নিলো মরিয়ম। যে মুখে অত বড় কথা উচ্চারণ করেছে মনসুর, সে মুখের দিকে একটিবারও আর ফিরে তাকাতে না সে।

তবু তাকাতে হলো।

তবু ওর পাশে এসে দাঁড়ালো মরিয়ম। হাঁটু গেড়ে বসে আশ্চর্য কোমল গলায় শুধালো আমি চলে গেলে সত্যি খুশি হবে তুমি? মনসুর উঠে দাঁড়িয়ে অন্য সোফায় গিয়ে বসলো। তারপর জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে বিকৃত কণ্ঠে বললো, সত্যি তোমার লজ্জা-শরম বলতে কিছু নেই?

অকস্মাৎ কোন জবাব দিতে পারলো না মরিয়ম। সারা মুখ আরো স্নান হয়ে এলো তার। নীরবে, মেঝেতে বিছানা কাপেটের ওপর হিজিবিজি কাটতে কাটতে অবশেষে আশ্তে করে বললো, তাহলে তাই হবে, তুমি যা চাও তাই করবো আমি। ওর কথাগুলো মনসুর শুনতে পেলো কিনা বোঝা গেলো না।

কদিন ধরে শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি। মাঝে মাঝে একটু থামে, হয়তো ঘণ্টাখানেকের জন্যে, তারপর আবার আকাশ কালো করে নেমে আসে ঝপ ঝপ শব্দে।

একটানা বৃষ্টি হলে ফাটলগুলো চুঁইয়ে ঘরে উপটপ পানি পড়ে। এ ঘরে সে ঘরে হেঁটে সালেহা বিবি দেখছিলেন কোথায় পানি পড়ছে। সেখানে একটি করে মাটির পাত্র বসিয়ে দিয়ে গেলেন তিনি। হাসিনা বললো, বাড়িওয়ালাকে ডেকে ঘরটা মেরামত করে দিতে বলো না কেন?

সালেহা বিবি বললেন, তোর দুলাভাই বলেছে এ মাসের মধ্যে একটা বাড়ি দেখে নিয়ে যাবে আমাদের। তাই তোর বাবা আর মেরামতের জন্যে গা লাগান নি।

হাসিনা বললো, কবে যে এ বাড়ি থেকে যাবো, একটু ছাতেও উঠতে পারি নে।

সালেহা বিবি পানি পড়ার জায়গাগুলো লক্ষ্য করতে করতে বললো, মাহমুদটার জন্যে, নইলে এতদিনে তোর দুলাভাই এখান থেকে নিয়ে যেতো আমাদের।

হাসিনা ঠোঁট বাঁকিয়ে বললো, ভাইয়াটা যে কী?

কথাটা কানে গেলে নিশ্চয় একটা কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে দিতো মাহমুদ। এমনিতে কম হৈ চৈ করে নি সে। মাকে ডেকে নিয়ে বলেছে, দেখো মা, তোমার জামাইকে বড় বেশি কৃপা দেখাতে নিষেধ করো। আমরা গরিব হতে পারি, কৃপার পাত্র নই। এ পাড়ার আরো পাঁচশো পরিবার এমনি ভাঙ্গাচোরা বাড়িতে থাকে। তোমার জামাই পারবে তাদের সবার জন্য নতুন বাড়ির বন্দোবস্ত করে দিতে? আমাদের ওপর অত বদান্যতা কেন? মেয়ে বিয়ে দিয়েছ বলে?

দেখ মাহমুদ, সব কাজে তোর এই বেয়াড়াপনা ভালো লাগে না আমার, বুঝলি? তীব্র গলায় ওকে আক্রমণ করেছে মা-এক পয়সার মুরোদ নেই, মুখে শুধু বড় বড় কথা।

আরো অনেকক্ষণ কথা কাটাকাটি করেছে ওরা। কিন্তু এ-ধরনের তর্কের সহজে মীমাংসা হয় না। হয়ও নি।

মাহমুদের ঘরে পানি পড়ছিলো। ওর বইপত্রগুলো আর বিছানাটা এক পাশে টেনে রেখে যেখানে যেখানে পানি পড়ছিলো সেখানে একটা করে মাটির পাত্র বসিয়ে দিলেন সালেহা বিবি। একরাশ সুরকির গুঁড়ো ঝরে পড়লো ওঁর সামনে। সালেহা বিবি উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন কোথেকে পড়লো। তারপর চিন্তিত মুখে চলে গেলেন সেখান থেকে।

সারা সকাল বৃষ্টি হলো। সারা দুপুর।

বিকেলের দিকে মেঘ সরে গিয়ে আকাশে সূর্য উঁকি দিলো। সোনালি রোদ ছড়িয়ে পড়লো দিগন্তে।

তসলিম এসেছিলো। তাকে নিয়ে পা টিপে টিপে ছাতে ওঠে হাসিনা। আকাশের ছবি নেবে।

তসলিম বললো, তোমার ক্যামেরা কেনার কী হলো?

হাসিনা বললো, দুলাভাই বলছিলেন বাজারে এখন ভালো ক্যামেরা নেই, এলে কিনে দেবেন উনি।

কিনে দেবেন না ছাই ছাতে এসে তসলিম বললো, বাজারে কত ক্যামেরা, আমাকে টাকা দিয়ে দাও না, আমি কিনে দেবো।

হাসিনা বললো, আচ্ছা।

তসলিম গিয়ে ছাতের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলো। হাসিনা চাপা গলায় চিৎকার করে উঠলো, ওখানে দাঁড়াবেন না, ভেঙ্গে পড়বে। এ পাশটায় আসুন।



কার্নিশের পাশে এসে বসলো ওরা। ক্যামেরাটা খুলে, কি আকাশের ছবি নিতে হয় ওকে দেখালো তসলিম আরো কাছে সরে ওর কাধের ওপর একখানা হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে দেখছিলো হাসিনা। লেন্সের মধ্য দিয়ে দেখতে পেলো আকাশটা আবার মেঘে ছেয়ে আসছে। বাতাসে বিক্ষিপ্তভাবে ছুটছে তারা।

ক্যামেরা বন্ধ করে তসলিম বললো, বৃষ্টি আসতে পারে আবার, নিচে চলো।

কাঁধে রাখা হাতটায় একটা জোরে চাপ দিয়ে হাসিনা বললো, উঁহু, এখন আসবে না।

তসলিম বললো, বাজি ধরো, ঠিক আসবে।

আসুক, আমি এখন উঠবো না।

কেন?

আমার বসে থাকতে ভালো লাগছে।

তসলিম মুখ ফিরিয়ে তাকালো ওর দিকে। হাসিনা ফিক করে হাসলো একটু। তারপর আঁচল দিয়ে ঠোঁটজোড়া ঢেকে সে বসে রইলো চুপ-চাপ। বৃষ্টি এলো না। সন্ধ্যা নেমে এলো।

রাতের অন্ধকার বাইরের পৃথিবী থেকে আড়াল করে নিয়ে গেলো ওদের। তসলিম বললো, রাত হয়ে গেছে, নিচে চলো।

উঁহু। কাঁধের ওপর থেকে হাতটা নামিয়ে নিলো হাসিনা। অন্ধকারে একজোড়া কটাকটা চোখের দিকে নীরবে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে অকস্মাৎ দু-হাতে ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিলো তসলিম। হাসিনা কোন বাধা দিলো না, শুধু অস্ফুটস্বরে কি যেন বললো, শোনা গেল না।

হাসিনা-আ। নিচে থেকে মায়ের গলা ভেসে এলো। একবার। দুবার তিনবার।

অপূর্ব শিহরনের দুজনে কঁপিছিলো ওরা। বাহুবন্ধন শিথিল হয়ে এলো ধীরে ধীরে। ছুটে ছাদ থেকে নেমে এলো হাসিনা।

মা, মাগো, ওমা, দৌড়ে এসে সালেহা বিবিকে জড়িয়ে ধরলো সে, মা, আমায় ডেকেছো মা?

ওকি অমন করছিস কেন?

জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিলো হাসিনা। চোখেমুখে আবার ছড়ানো। মাকে ছেড়ে দিয়ে—দুলু বসেছিলো মেঝেতে—তাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগলো হাসিনা—দুলু, দুলু-উ-উ। তোমার পুতুলগুলো কোথায়? চলো, দুজনে খেলবো আমরা।

কী খেলবে তুমি, পুতুল, পুতুল?

না, তোমার পুতুলের সঙ্গে আমার পুতুলের বিয়ে দেবো আজ।

দুলু খুশি হলো, আপা আজ তার সঙ্গে পুতুল খেলবে।

কিন্তু খানিকক্ষণ পুতুল নিয়ে বসে আপার আর মন বসলো না। ছুটে সে রান্নাঘরে মায়ের কাছে চলে এলো— মা, আজ কি পাক করছো মা?

সালেহা বিবি তরকারিতে লবণ ছিঁটিয়ে দিয়ে বললো, নতুন কিছু না, রোজ যা রান্না হয়, তাই।

মা আমি রাঁধবো, তুমি ঘরে যাও।

তরকারির কড়াই থেকে চোখ তুলে মেয়ের দিকে তাকালেন সালেহা বিবি। রান্না ঘরের ধার যে ঘেঁষে না তার আজ হঠাৎ পাক করার শখ হলো কেন? থাক, তোমাকে রাধতে হবে না, লেখাপড়া করো গিয়ে যাও।

মা, আমি তোমার পাশে বসবো মা। মায়ের পাশে এসে বসে পড়লো হাসিনা। খানিকক্ষণ পর আবার উসখুস করে উঠে গেলো সেখান থেকে। নিজের ঘরে এসে টেবিলের ওপর থেকে আয়নাটা তুলে নিয়ে বসলো সে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানাভাবে নিজেকে দেখলো হাসিনা। হেসে দেখলো। মুখখানা গম্ভীর

করে দেখলো। কপট রাগ করে, ঠোঁটজোড়া বাঁকিয়ে কারো সঙ্গে যেন কথা বললো সে।

হারিকেনের আলোয় বসে বই-এর ওপর চোখ বুলাচ্ছিলো মাহমুদ। ভাইয়া কি করছো? ওর সামনে এসে ঝুঁকে পড়ে কি পড়ছে দেখলো হাসিনা, ভাইয়া, তুমি একটা বিয়ে করো ভাইয়া, আমাদের বুঝি ভাবী দেখতে ইচ্ছে করে না?

কী ব্যাপার, আমার বউ দেখার জন্যে হঠাৎ তোমার মন কেঁদে উঠলো কেন? বইয়ের পাতার ওপর চোখ রেখে জবাব দিলো মাহমুদ-যাও, নিজের বিয়ের কথা চিন্তা করো গিয়ে।

হাসিনার মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে গেলো। ‘খ্যাৎ, আমি বিয়ে করবো না’ বলে সেখান থেকে পালিয়ে এলো হাসিনা। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পা জোড়া উপরের দিকে তুলে দোলনার মত দোলাল সে। তারপর বালিশে মুখ গুঁজে চোখ বুজলো। মিটিমিটি হাসলো। চোখের পাতায় একটি মুখ ভাসছে বারবার আর একটি ছবি। বালিশটাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরলো হাসিনা।

সারারাত একটানা বৃষ্টি হলো।

সকালেও।

অপরাহে তখনো গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি ঝরছিলো বাইরে।

হাসমত আলী অফিসে গেছেন, মাহমুদ তার প্রেসে। বৃষ্টির জন্যে, হাসিনা আর খোকন কেউ স্কুলে যায় নি আজ। সালেহা বিবি ভরে যাওয়া মাটির পাত্রগুলো থেকে পানি ফেলে দিয়ে আবার বসিয়ে দিচ্ছিলেন পুরোনো জায়গায়।

টপটপ পানি পড়ছে ফাটলগুলো থেকে চুইয়ে। মাঝে মাঝে সুরকির গুড়ো, ইটের কণা।

দুয়ারে কড়া নাড়ার মৃদু শব্দ হতে, দরজা খুলে দিয়ে চিৎকার করে উঠলো হাসিনা-মা, মাগো, কে এসেছে দেখে যাও, মা।

একটা চামড়ার সুটকেস হাতে দাঁড়িয়ে ছিলো মরিয়ম। জড়িয়ে ধরে তাকে ভিতরে নিয়ে এলো হাসিনা। দুলু ছুটে এসে আঁচল ধরে দাঁড়ালো তার।

মা ডেকে শুধালো—কে এসেছে হসি?

হাসিনা জবাব দিলো, আপা এসেছে। সুটকেসটা ওর হাত থেকে নিয়ে নিলো হাসিনা।

মরিয়ম দুলুকে কোলে তুলে আদর করলো।

দাদার ঘরে উঁকি মেরে মাহমুদ আছে কিনা দেখলো মরিয়ম।

হাসিনা বললো, সেই ভোরে বেরিয়ে গেছে।

মায়ের খাটের ওপর এসে বসলো মরিয়ম। চারপাশে তাকিয়ে বললো, ইস, ভীষণ পানি পড়ছে তো?

কিরে, তুই একা এলি, জামাই আসেনি? কুয়োতলা থেকে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এসে বললেন সালেহা বিবি। জামাই এলো না কেন?

মরিয়ম স্নান হয়ে বললো, কাজের ভীষণ চাপ।

খোকন বললো, আমার জন্যে টফি আনিস নি আপা!

এনেছি। আশেপাশে তাকিয়ে সুটকেসটা খোঁজ করলো মরিয়ম। হাসিনা বললো, ওটা ও-ঘরে রেখে এসেছি, নিয়ে আসি।

সুটকেস নিয়ে এলে, খুলে দুটো টিন বের করলো মরিয়ম। বিস্কিট আর টফি। বিস্কিটের টিনটা মায়ের হাতে দিয়ে সে বললো, এটা রেখে দাও মা। নাস্তার সময় দিও।

মায়ের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মেয়ের পাশে এসে বসলেন তিনি।

টফির টিনটা খুলে খোকন আর দুলুকে কয়েকটা টফি দিলো মরিয়ম। হাসিনাকেও দিলো। সালেহা বিবির হাতে একমুঠো টফি গুঁজে দিতে তিনি হেসে বললেন, আমায় কেন?

মরিয়ম বললো, খাও মা।

হাসিনা বললো, মাকে মিছিমিছি দিচ্ছিস আপা। মা কি খাবে? এই রান্ধস দুটোর পেটে যাবে সব। বলে তর্জনী দিয়ে দুলু আর খোকনকে দেখালো হাসিনা।  
খোকন জিভ বের করে ভেংচি কাটলো।

ওকে অনুসরণ করে দুলুও জিভ বের করলো হাসিনাকে উদ্দেশ্য করে।  
হাসিনা দাঁতমুখ খিঁচে বললো, আবার বের কর না, একেবারে কেটে দেবো।

একটা টফি কাগজ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মুখে দিলেন সালেহা বিবি।  
বারকয়েক চুষে বললো, বেশ মিষ্টিতো। তুই খাচ্ছিস না কেন, একটা খা-না।

মরিয়ম সুটকেসের ডালাটা বন্ধ করলো ধীরে ধীরে। মায়ের অনুরোধ কানে গেলো না ওর।

মুঠোয় ধরে রাখা টফিগুলো আঁচলে বেঁধে রাখলেন সালেহা বিবি। হাসমত আলীকে আজ খাওয়াবেন একটা আর মাহমুদকে।

এতক্ষণে ইতিউতি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ভালো করে নজরে পড়ে নি সালেহা বিবির। এবার মেয়ের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন, হ্যাঁরে মরিয়ম, তুই অমন শুকিয়ে গেছিস কেন, অসুখ করেছিলো নাকি?

এই ভয়টাই এতক্ষণ করছিলো মরিয়ম। মায়ের চোখে কিছু এড়াবে না তা জানতো সে। গত এক মাসে শরীরটা অনেক খারাপ হয়ে গেছে সেটা বুঝতে পারে মরিয়ম। দিনে রাতে অবিচ্ছিন্ন চিন্তার স্রোতে ডুবে থাকলে, আঘাতে আর যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হলে শরীর ভালো থাকার কথা নয়।

ওকে চুপ থাকতে দেখে মা আবার বললো, কি হয়েছিলো?

হাসিনা বললো, তাইতো তোকে বড্ড রোগা লাগছে আপা।

মরিয়ম পরক্ষণে একটা মিথ্যা কথা বললো, ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছিলো।

ওর মুখখানা কোলে নিয়ে মা বললো, বেশ মেয়েতো, অসুখ করেছিলো আমাদের একটু খবর দিতে পারলি না? আমরা কি পর হয়ে গেছি তোর?

হাসিনা বললো, খবর পাঠালে আমি দেখতে যেতাম।

চোখ ফেটে কান্না আসছিলো মরিয়মের। একটু কাঁদতে পারলে বোধ হয় শান্তি পেত সে। কিন্তু কেঁদে সকলকে বিব্রত করতে চায় না মরিয়ম। মায়ের কোল থেকে মাথা তুলে সে বললো, কাপড়টা বদলিয়ে নিই মা।

সাঁঝরাতে আকাশ ফর্সা হয়ে তারা দেখা দিলো। একটা মেঘও আকাশে নেই এখন।

সালেহা বিবি বললো, তারা উঠলে কি হবে, এ-সময়ে আকাশকে একটুকুও বিশ্বাস নেই, দেখবে আবার রূপরূপ করে নেবে আসবে একটু পরে।

হাসমত আলী বললো, বাড়িওয়ালাস সঙ্গে আলাপ হয়েছে। দুএকদিনের মধ্যে মিস্ত্রী পাঠাবে।

দু-একদিনের কথা বলেছে তো, দেখবে দশ দিন লাগবে। স্বামীর কথাও ওপর মন্তব্য করলেন সালেহা বিবি। বলে মরিয়মের দিকে তাকালেন তিনি। সবার চোখ এ মুহূর্তে তার ওপর গিয়ে পড়েছে। কারণ মনসুর বলেছিলো—একটা ভালো বাসা দেখে ওদের নিয়ে যাবে। স্নানমুখে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো মরিয়ম। বাবা কিংবা মায়ের দিকে তাকাতে ভয় হলো ওর। যদি তারা সে ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করে। তাহলে এখন কোন জবাব দিতে পারবে না সে। মনসুর যে অনেক বদলে গেছে সে খবর তো কারো জানা নেই।

একটু পরে সেখান থেকে উঠে হাসিনার কামরায় চলে গেলো মরিয়ম। হ্যাঁরে হাসি, তসলিম এসেছিলো না, চলে গেছে?

কি একটা কাগজ নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো হাসিনা। ও আসতে কাগজটা লুকিয়ে ফেলে সে বললো, হ্যাঁ, চলে গেছে।

ওটা কিরে?

না কিছু না। মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে বই নিয়ে বসলো হাসিনা। ভাইয়ার সঙ্গে দেখা করো নি? উনি এসেছেন তো।

তাই নাকি! আঁচলটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে আবার বেরিয়ে এলো মরিয়ম।

বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পায়ের ওপর পা তুলে, নিঃশব্দে সিগারেট টানছিলো মাহমুদ। ভাইয়া কেমন আছো? মরিয়ম এসে বসলো মেঝের উপর।

মরিয়ম যে। পা-জোড়া নাবিয়ে নিলো মাহমুদ-বাবার বাড়ি সফর করতে এসেছে বুঝি।

মরিয়ম মৃদু গলায় বললো, তুমি তো একটা দিনও গেলে না।

বার কয়েক ঘনঘন সিগারেটে টান দিলো মাহমুদ। তারপর ছাই ফেলে বললো, তুমি জানতে আমি যাবো না, তবু মিছে অভিমান করছো। ভাবছো আমি বড় নির্দয়। সত্যি আমি তাই। কারো জন্যে আমার কোন অনুভূতি নেই। বাবা, মা, ভাই বোন এই যে, কতগুলো শব্দের সৃষ্টি করেছে তোমরা, একটা অর্থহীন সম্পর্ক গড়ে তুলেছে এর কোন মূল্য আছে? অন্তত আমার কাছে নেই। সিগারেটে একটা জোরটান দিয়ে ধোয়া ছাড়লো মাহমুদ। তারপর আবার বললো, আমি তো দুটি সম্পর্ক ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্ব দেখি না। ওই বড় লোকের বাচ্চাগুলো যারা মুরগির মত টাকার ওপর বসে বসে তা দিচ্ছে আর আমরা গরিবের বাচ্চারা যাদের ওরা ছোটলোক বলে। এই দুটো সত্য ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না আমার। তুমি হয়তো মনে বড় আঘাত পাচ্ছে, কিন্তু কি আর বলবো বলো, ওরা হলো আমাদের মা, বাপ আর আমরা ওদের ছা-পোষা, জীব। থাকগে কেমন আছো বলো-সিগারেটের গোড়াটা ছুড়ে ফেলে দিলো মাহমুদ।

মরিয়ম আঙুল দিয়ে মেঝেতে দাগ কাটতে কাটতে বললো, ভালো।

ভালো যে থাকবে তা জানতাম। ছাদের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলে মাহমুদ-তোমার মত কপাল কজন পেয়ে থাকে। বাড়ি-গাড়ি, অর্থ সবই পেয়েছে তুমি। আর আমাদের অবস্থাটা একবার দেখো, সারাদিন খেটে এসে এমন খাদের মধ্যে শুয়ে আছি। টপটপ করে ঘরের মধ্যে বৃষ্টি পড়ছে। এটা নিশ্চয়ই

আরামদায়ক নয়, কী বলো? মরিয়মকে কোন কথা না বলতে দেখে মাহমুদ আবার বললো, মাঝে মাঝে কী মনে হয় জানো, পুরুষ হয়ে না জন্মে যদি তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে হয়ে জন্মাতাম তাহলে বেশ হতো। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো মাহমুদ। মরিয়ম তবু কোন কথা বলছে না দেখে আবার বললো, হ্যাঁ, তোমার সেই বান্ধবীটির কি খবর বলতো?

মরিয়ম মুখ তুলে তাকালো, কার কথা বলছো?

মাহমুদ বললো, সেই যে-কি নাম যেন-যাক-গে বাদ দাও তার কথা, ওসব জেনে আমার কোন কাজ নেই। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বিড়ি আছে কিনা খুঁজে দেখলো সে।

সালেহা বিবি এসে খাবার জন্য ডেকে গেলেন সকলকে। ও-ঘর থেকে হাসিনার গলা শোনা গেলো-আপা খাবি চল।

মরিয়ম উঠে পড়লো, ভাইয়া খাবে না?

যাও আসছি-মাহমুদ উঠে বসলো।

রান্না ঘরটা ভিজে থাকায় শোবার ঘরে খাটের পাশে একটা মাদুর বিছিয়ে খাওয়ার আয়োজন করেছেন সালেহা বিবি। অনেকদিন পরে একসঙ্গে খেতে বসলো ওরা। দুলুকে নিয়ে হাসমত আলী বসলেন সবার ডান দিকটায়। তার পাশে বসলো মাহমুদ। তারপর হাসিনা আর মরিয়ম। একেবারে বা পাশটায় খোকন। সালেহা বিবি বসলেন সবার দিকে মুখ করে মাঝখানটায়। নিজে খাবেন এবং সকলকে পরিবেশন করবেন তিনি। অনেকদিন পর এক সঙ্গে খেতে বসে আনন্দের আভা জেড়ে উঠলো সবার চোখে-মুখে। সালেহা বিবি সবচেয়ে খুশি। ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে বসিয়ে খাওয়ানোর তৃপ্তি ও আনন্দ যে কি পরিমাণ সেটা শুধু মা-ই জানেন। তাদের খাওয়ার মাঝখানে আবার আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামলো। বাইরে তাকিয়ে, হাতটা ধুয়ে নিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন সালেহা বিবি।

হাসিনা বললো, কোথায় যাচ্ছ মা।



সালেহা বিবি বললেন, আবার বৃষ্টি এলো, মাটির ভাঙগুলো জায়গা মত আছে কিনা দেখে আসি, নইলে সব ভিজে যাবে।

মরিয়ম বললো, খেয়ে নাও মা, এই তো বৃষ্টি এলো, অত তাড়াতাড়ি ভিজবে না।

মাহমুদ বললো, ভিজলে ভিজুক, তোমাকে আবার খাওয়ার মাঝখানে উঠতে বললো কে?

আবার বসে পড়লেন সালেহা বিবি। কিন্তু বসেও স্বস্তি পেলেন না তিনি, বারবার উপরের দিকে তাকাতে লাগলেন। কোথায় পানি পড়ছে কে জানে। এক মুখ ভাত চিবোতে মাহমুদ বললো, বাবার সেই পুরোনো ছাতাটা আছে তো ঘরে?

সালেহা বিবি জবাব দিলেন, আছে, কেন?

আমার প্রেসে যেতে হবে।

এই বৃষ্টির মধ্যে?

হ্যাঁ। আজ রাতে অনেকগুলো প্রফ দেখতে হবে আমায়, সব জমা হয়ে আছে।

সকলে একবার করে তাকালো মাহমুদের দিকে। তারপর নীরবে খেতে লাগলো।

অনেকদিন পর নিজের সেই পুরোনো বিছানায় শুয়ে আজ কেমন নতুন নতুন ঠেকছিলো মরিয়মের। হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে চুপচাপ উদাম বৃষ্টির রিমঝিম গান শুনছিলো আর ভাবছিলো মনসুরের কথা। লিলি বলে, সে ভুল করেছে। হয়তো তাই। সব কিছু ওকে খুলে না বললেও হতো। তাহলে মনসুর নিশ্চয় এমন ব্যবহার করতো না তার সাথে। যেমন চলছিলো সব কিছু তেমনি চলতো। হাসি আর আনন্দের অফুরন্ত স্রোতে ভাসতো ওরা দুজনে। কিন্তু সত্যকে ঢেকে রাখার কি অর্থ হতে পারে। মরিয়ম জাহেদকে ভালোবেসেছিলো। হ্যাঁ, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলো। মনসুরকেও সে তেমনি ভালবেসেছে।

নিজের সকল সত্তা আর সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে আপনার করে নিতে চেয়েছে। দুটোই সত্য। মরিয়ম বুঝতে পারে না এ সত্যের সহজ স্বীকৃতিতে ভুল কোথায়। সেকি মিথ্যের মুখোশ পরলে মনসুর সম্ভুষ্ট হতো? দুবার কি মানুষ প্রেমে পড়তে পারে না? মনসুর কেন এমন হয়ে গেলো? হাসিভরা জীবনের মাঝখানে অশ্রু কেন এলো? ভাবতে গিয়ে দুচোখ সজল হয়ে এলো মরিয়মের। ফাটল বেয়ে টপটপ পানি ঝরে পড়ছে নিচে। সেদিকে চেয়ে চেয়ে এক সময় সে মনে মনে ঠিক করলো ফিরে গিয়ে মনসুরকে তার এই যন্ত্রণার কথা খুলে বলবে মরিয়ম। করজোড়ে তার কাছে পুরোনো দিনগুলো আবার ভিক্ষে চাইবে। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লো সে। জানালা গলিয়ে আসা বাতাসে চুলগুলো উড়ছে ওর। এতক্ষণে মরিয়ম স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।

মেঝেতে বিছানো মাদুরটার ওপর বালিশটা বুকের নিচে দিয়ে উপুড় হয়ে পা-জোড়া ছড়িয়ে দিয়েছে হাসিনা দরজার দিকে। সামনে একটা সাদা কাগজ আর কলম। হ্যারিকেনের আলোটা আরেকটু বাড়িয়ে দিয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে অদূরে চৌকির ওপরে শোয়া মরিয়মের দিকে তাকিয়ে ধীরেধীরে ব্লাউজের ভেতর থেকে একটা চিঠি বের করলো হাসিনা। তসলিমের চিঠি। বিকেল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত তিন-চারবার চিঠিখানা আগাগোড়া পড়েছে। তবু উত্তর দেবার আগে আরেকবার পড়ে নিলো সে। তারপর অতি যত্নসহকারে গোটা গোটা করে লিখলো হাসিনা—প্রিয় লিখেই কেটে দিলো। কী সম্বোধন করা যেতে পারে? সে লিখেছে ‘হাসি’ সম্বোধন করে। বারকয়েক কাটা ছেড়ার পর হাসিনা লিখলো—

তসলিম,

“তুমি আমাকে অনেক অনেক ভালবাস, আমাকে ছাড়া বাঁচবে না লিখেছ। আমারও তাই মনে হয়। সেদিন বিকেল থেকে কিছু ভাল লাগছে না আমার। তোমাকে সব সময় দেখতে ইচ্ছে করে। আমার হাতের লেখা ভীষণ খারাপ।

আর তোমার মত সুন্দর করে গুছিয়ে আমি লিখতে পারি না। বাবা মা কেউ-এ ব্যাপারটা জানে না। সত্যি তোমার জন্য মনটা আমার সব সময় খারাপ হয়ে থাকে। তুমি আমাকে ভালবাস, কিন্তু আমি দেখতে ভীষণ বিস্ত্রী। তুমি কত সুন্দর!”

এখানে এসে চোখজোড়া ঘুমে জড়িয়ে আসছিলো হাসিনার। অসমাপ্ত চিঠিটা খাতার মধ্যে লুকিয়ে সেটা বালিশের তলায় রেখে দিলো সে। হ্যারিকেনটা নিভিয়ে দিয়ে সেখানেই শুয়ে পড়লো। ধীরে ধীরে ঘুমের সমুদ্রে তলিয়ে গেলো হাসিনা। ঠোঁটের কোণে শুধু ছড়িয়ে রইলো এক টুকরো প্রশান্ত হাসি।

এ-ঘরে বাতি নিভে গেলেও ও-ঘরে আলো জ্বলছিলো। হাসমত আলী আর সালেহা বিবি তখনও জেগে। টিমটিমে হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে পুরো বাড়িটা একবার ঘুরে গেলেন সালেহা বিবি। নতুন কোথাও পানি পড়ছে কিনা। দরজাটা বন্ধ না খোলা দেখে গেলেন। হাসিনার গায়ের কাপড়টা উঠে গিয়েছিলো, উপড় হয়ে সেটা নামিয়ে দিলেন তিনি। তারপর নিজের কামরায় ফিরে এসে হ্যারিকেনটা রাখলেন মেঝের উপর। ওরা কি ঘুমিয়ে পড়েছে শোবার আয়োজন করতে করতে শুধোলেন হাসমত আলী।

হ্যাঁ। কুয়োতলার দিকটার দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে খাটের ওপর এসে বসলেন সালেহা বিবি।

বাইরে বৃষ্টি ঝরছে রিমঝিম। একটানা বর্ষণ। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস দেয়ালের গায়ে লেগে করুণ বিলাপে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে, পৃথিবীর চোখে অশ্রু ঝরছে, বিষন্ন ব্যথার চাপে?

বাতিটা নিভিয়ে দাও। শুয়ে পড়লেন হাসমত আলী।

হ্যারিকেনটা নিভিয়ে দিতে অন্ধকার গ্রাস করে নিলো ঘরটা। কোথায়  
একটা টিকটিকি ডেকে উঠলো টিকটিক শব্দে। দু-হাতে নিজের জায়গাটা হাতড়ে  
নিয়ে কাত হলেন সালেহা বিবি। মাঝখানে দুলু আর খোকন।

দুপাশে-ওঁরা দু-জন, হাসমত আলী আর সালেহা বিবি।

খানিকক্ষণ পর সালেহা বিবি ডাকলেন, শুনছো?

উঁ। সারা দিলেন হাসমত আলী।

ঘুমুচ্ছে নাকি?

না।

কাল মরিয়মকে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করবো?

কোনটা?

মনসুর যে বলেছিলো একটা নতুন বাসায় নিয়ে যাবে আমাদের।

মাহমুদের সঙ্গে আলোচনা করো।

বাইরে বৃষ্টির উদাম নৃত্য চলছে। ভেতরে টপটপ বৃষ্টি পড়ছে ফাটলগুলো  
বেয়ে। মাঝে মাঝে ভেজা সুরকির গুড়ো।

শুনছো? আবার সালেহা বিবির গলা।

কী?

এ বাড়িতে থাকা আর ঠিক হবে না। আমার ভীষণ ভয় করে।

হাসমত আলীর কাছ থেকে এবার কোন উত্তর পেলেন না সালেহা বিবি।

মৃদু নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে তার। একটু পরে তিনিও তন্দ্রার কোলে ঢলে  
পড়লেন।

এখন সকলে গভীর ঘুমে অচেতন।

তখনো বৃষ্টি থামে নি। ইলশেগুঁড়ির মত ঝরছে।

প্রেসের কাজ শেষ করে, দুচোখ ঘুম নিয়ে, ভোর হবার কিছু আগে বাসার পথে ফিরে এল মাহমুদ।

গলির মাথায় তিন-চারখানা ফায়ার বিগ্রেডের লাল গাড়ি দাঁড়ানো। গলির ভেতরে আবছা অন্ধকারে লোকজন ভিড় করে আছে। ওকে দেখে চিনতে পেরে অনেকে অবাক চোখে তাকালো। দু-একজন এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলো, আপনি কি বাইরে ছিলেন নাকি?

কোথায় ছিলেন আপনি?

কোথেকে এসেছেন?

ছেলে বুড়োরা ওকে ঘিরে দাঁড়ালো। দু-পাশের জীর্ণ দালান ভাঙ্গা জানালাগুলো দিয়ে বাড়ির ঝি-বউ-এর- উঁকি মেরে দেখলো ওকে।

প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালো মাহমুদ। গলিতে এত ভিড় কেন, ফায়ার বিগ্রেডের লোকগুলোই বা এত ছুটোছুটি করছে কেন?

আহা বেচারী! কে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো জানালার ওপাশ থেকে।

কেউ কি বেঁচে নেই?

বোধ হয় না।

সমস্ত দেহটা অজানা শঙ্কায় শিরশির করে উঠলো মাহমুদের। মনে হলো হাত-পাগুলো সব ভেঙ্গে আসছে তার। দাঁড়িয়ে থাকার শক্তিও পাচ্ছে না সে। তবু দু-হাতে ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে গেলো মাহমুদ। সকলে নীরবে পথ ছেড়ে দিলো তাকে। সবাই ভেবেছিলো বাসার সামনে এসে একটা তীব্র আতর্নাদে ফেটে পড়বে সে। কিন্তু সে আতর্নাদ করলো না, থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। সামনের ভগ্নস্তূপটার দিকে নিশ্চল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মাহমুদ। বাতি হাতে ফায়ার বিগ্রেডের লোক ছুটোছুটি করছে। উদ্ধারের কাজ চালাচ্ছে ওরা।

পেছনের বাড়ির সরু বারান্দাটার ওপর থপ করে বসে পড়লো মাহমুদ। মনে হলো এ মুহূর্তে অনুভূতিগুলো তার মরে গেছে। সে যেন এক শূন্যতায় ডুবে গিয়ে, ফাপা বেলুনের মত বাতাসে দুলছে। না, মাথাটা ঘুরছে ওর। দেহটা টলছে। কিন্তু, হৃদয়ে কোন জ্বালা নেই।

ধীরে ধীরে ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

মাহমুদ তেমনি বসে।

একটা কথাও এতক্ষণে বলে নি সে। কী বলবে?

পাড়ার লোকেরা আলাপ করছিলো নিজেদের মধ্যে। মাঝরাতে একটা ভয়ংকর শব্দে জেগে উঠে হকচকিয়ে গিয়েছিলো সকলে। এমন ভয়াবহ শব্দ কোথা থেকে এলো? পরে তারা একে একে দেখতে পেলো হাসমত আলীর বাড়িটা ধ্বসে পড়েছে। ঘর ছেড়ে সকলে ছুটে বেরিয়ে এলো। কিন্তু অন্ধকারে ভাঙ্গা ইটের স্তূপ ছাড়া আর কিছু নজরে এলো না কারো।

ইটের স্তূপ সরিয়ে একটা মৃতদেহ বের করে, স্ট্রেচারে তুলে এনে ওর সামনে মুহূর্ত কয়েকের জন্য দাঁড়ালো ফায়ারবিগ্রেডের চারজন লোক। একনজর তাকিয়ে, দাঁতে দাত চেপে চোখজোড়া অন্যদিকে সরিয়ে নিলো মাহমুদ। মাথাটা খেতলে গেছে মরিয়মের। কি কদাকার লাগছে এখন তাকে। মারা গেছে সে। কেন মরলো? কেনই বা সে গতকাল আসতে গিয়েছিলো এখানে। না এলে সে নিশ্চয় মরতো না। ওদের বাড়ি নিশ্চয় ধ্বসে পড়বে না এভাবে। তাহলে, মৃত্যুই কি তাকে টেনে এনেছিলো এখানে? হাসিনার মৃতদেহটা আবিষ্কৃত হলো একটু পরে। গলাটা ভেঙ্গে গেছে তার। ঝুলে আছে দেহ থেকে; মাহমুদের মনে হলো ওর ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি লেগে আছে। মেয়েটা কি হাসতে হাসতে মারা গেছে? ও বয়সে যদি মারা যেতে হলো তবে সে জন্মেছিলো কেন? আর এখন সে কোথায় আছে? মৃত্যুর পর কোথায় যায় মানুষ কাল রাতে তাদের সকলকে দেখেছে মাহমুদ। হাসছিলো। কথা বলছিলো। হেঁটে বেড়াচ্ছিলো এ ঘর

থেকে সে ঘরে। এখন তারা কোথায়? তাদের দেহগুলো এখনো দেখতে পাচ্ছে সে। কিন্তু তারা নেই। কেন এমন হলো!

চারপাশে লোকজনের কোলাহল বেড়েছে এখন। মানুষের ভিড়। ছেলে বুড়ো জোয়ান মরদ গিজগিজ করছে এসে। মাহমুদ উদাস দৃষ্টি মেলে তাকালো সবার দিকে। খবর পেয়ে থানা থেকে একদল পুলিশও এসেছে।

দুলুর মৃতদেহটা স্ট্রচারে করে সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। মাথার মগজগুলো সব বেরিয়ে গেছে ওর। সারাদেহ রক্তে চবচব করছে।

আহা, বাচ্চাটা—। কে যেন আফসোস করছিলো।

বাচ্চা নয়, কুত্তার বাচ্চা। নইলে অমন করে মরতে হলো কেন? দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করে উঠলো মাহমুদ। পরক্ষণে ওর মনে হলো, তাই তো সেও মারা যেতে পারতো। রাতে বাসায় থাকলে সেও মরতো আর এমনি স্ট্রচারে করে মৃতদেহটা নিয়ে যাওয়া হতো তার। তারপর কবর দেয়া হতো আজিমপুর গোরস্থানে। তারপর কি হতো? কোথায় থাকতো, কোথায় যেত মাহমুদ ভাবতে গিয়ে তার মনে হলো দেহের লোমগুলো সব খাড়া হয়ে গেছে। ঘাম দিচ্ছে সারা গায়ে।

হাসমত আলী সাহেবের বড় ছেলে আপনি, তাই না? সামনে একজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে।

কেন, কি চাই আপনার? অডুত গলায় জবাব দিলো মাহমুদ।

যারা মারা গেছেন তাদের সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে একটা রিপোর্ট নিতে হবে।

কী করবেন রিপোর্ট নিয়ে? হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো মাহমুদ— পারবেন আজরাইলকে গ্রেপ্তার করে ফাঁসে ঝোলাতে? পারবেন ওই-ওই বড়লোকের বাচ্চাগুলোকে শূলে চড়াতে? কী করবেন আপনারা রিপোর্ট নিয়ে?

পুলিশ অফিসার হকচকিয়ে গেলেন।

ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন বললো, পুলিশ লাইনের লোকগুলোর মাথায় কি গোবর পোরা থাকে নাকি মশাই? এ সময়ে তাকে জ্বালাতে গেছেন কেন? আর সময় নেই?

অল্প কটা কথা বলে রীতিমত হাপাচ্ছিলো মাহমুদ। দুহাতে কপালটা চেপে ধরে চুপচাপ বসে রইলো সে। সারা দেহ বেয়ে ঘাম ঝরছে তার।

বিকেলে আজিমপুর গোরস্থানে কবরস্থ করা হলো মৃতদেহগুলোকে। খবর পেয়ে মনসুর এসেছিলো। বোবা হয়ে গেছে সে। সব কিছু কেমন আকস্মিক আর অস্বাভাবিক মনে হলো তার।

এতক্ষণে মাহমুদের সঙ্গে একটা কথাও হয়নি তার। দু-জনে নির্বাক। গোরস্থান থেকে বেরিয়ে এসে কাঁপা গলায় বললো, কোথায় যাবেন এখন, ভাইজান?

মাহমুদ নীরবে পথ চলতে লাগলো।

পেছন থেকে এসে ওর একখানা হাত চেপে ধরলো মনসুর। টোক গিলে বললো, আমার ওখানে চলুন ভাইজান।

এতক্ষণে ওর দিকে তাকালো মাহমুদ। একটা অর্থহীন দৃষ্টি তুলে দেখলো তাকে। তারপর ধীরে ধীরে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে টলতে টলতে সামনে এগিয়ে গেলো সে। মনসুর কাতর গলায় বললো, আমাকে ভুল বুঝবেন না।

মাহমুদের কানে কথাটা এলো কিনা বোঝা গেল না। আগের মত পথ চলতে লাগলো সে। পুরো সন্কেটা পথে পথে ঘুরে কাটিয়ে দিলো মাহমুদ। সেও মরতে পারতো, কিন্তু বেঁচে গেছে; অদ্ভুতভাবে বেঁচে গেছে সে। কাল যারা ছিল আজ তারা নেই। নেই একথা ভাবতে গিয়ে বিশ্বাস হলো না তার। মনে হলো তারা বেঁচে আছে। তাদের কথাবার্তা সব শুনতে পাচ্ছে সে। দেখতে পাচ্ছে তাদের। কিন্তু তারা নেই। এ জীবনে দ্বিতীয়বার আর সেই রক্ত-মাংসের দেহগুলোকে দেখতে পাবে না মাহমুদ। তারা গেছে। চিরতরে ছেড়ে গেছে এই



পৃথিবীর মায়া। সারা দেহটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে এলো। মাথার শিরাগুলো বুঝি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

বিশ্রামাগারের দোরগোড়ায় পা রাখতে, কেরোসিন কাঠের কাউন্টারের ওপাশ থেকে খোদাবক্স ঝুঁকে পড়ে তাকালো ও দিকে।

খবরটা ইতিমধ্যে কানে এসেছে তার। কাউন্টার ছেড়ে বেরিয়ে এসে ওর পাশে দাঁড়ালো খোদাবক্স। আশ্বে ওর পিঠের ওপর একখানা হাত রেখে মৃদু গলায় বললো, আমি সব শুনেছি মাহমুদ সাহেব। কি আর করবেন, সব খোদার ইচ্ছা।

মাহমুদ তার লাল টকটকে একজোড়া চোখ মেলে তাকালো ওর দিকে। তারপর অকস্মাৎ দুহাতে ওর গলাটা টিপে ধরে চিৎকার করে উঠলো সে, সব খোদার ইচ্ছা, শালা জুচ্চুরির আর জায়গা পাও নি। গলাটা টিপে এখনি মেরে ফেলবো তোমায়, দেখি কোন্ খোদা বাঁচাতে আসে, শয়তানের বাচ্চা কোথাকার।

তীব্র আত্ননাদ করে ছিটকে পিছিয়ে গেল খোদাবক্স। রেস্টোরাঁয় আর যারা ছিলো তারা সকলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

টলতে টলতে আবার বাইরে বেরিয়ে এলো মাহমুদ।

আরো অনেকক্ষণ রাস্তায় ঘুরে বেড়ালো সে।

মাঝ রাত্রে প্রেসে এসে লম্বা হয়ে বেঞ্চটার ওপর শুয়ে পড়লো মাহমুদ। ম্যানেজার তাকে দেখে কি যেন জিজ্ঞেস করলো। কিছু কানে গেলো না ওর। লাল চোখজোড়া মেলে একবার তাকিয়ে আবার চোখ মুদলো সে। ম্যানেজার উঠে এসে ঝুঁকে পড়ে দেখলো ওকে, তারপর গায়ে হাত লাগতে আঁতকে উঠলো। পরপর চারটে দিন জ্বরে অচেতন্য হয়ে রইলো মাহমুদ।

প্রলাপ বকলো।

ঘুমোল।

আবার প্রলাপ বকলো।

চতুর্থ দিনের মাথায় জ্ঞান ফিরে আসতে চোখ খুলে মাহমুদ দেখলো একটা পরিচিত মুখ ঝুঁকে পড়ে দেখছে তাকে। প্রথমে মনে হলো মরিয়ম। তারপর মনে হলো হাসিনা। অবশেষে ভালো করে তাকিয়ে দেখলো, লিলি। লিলি দাঁড়িয়ে।

আমি কোথায় আছি এখন? কাতর গলায় প্রশ্ন করলো মাহমুদ। সারা মুখে বিস্ময়। লিলি মাথার কাছ থেকে পাশে এসে বসলো তার। বললো, কেমন লাগছে এখন আপনার?

আমার কি হয়েছে? কোথায় আছি আমি? মা, ওরা কোথায়? একসঙ্গে তিনটি প্রশ্ন করলো মাহমুদ। বিস্ময়ের ঘোর এখনো কাটে নি তার।

লিলি মুখখানা সরিয়ে নিলো অন্য দিকে।

ধীরে ধীরে সব কিছু মনে পড়লো মাহমুদের। মা, বাবা, মরিয়ম, হাসিনা, দুলু, খোকন-একে একে সবার কথা মনে পড়লো তার। মৃতদেহগুলো ভেসে উঠলো চোখের উপর। তাইতো, তারা সকলে মারা গেছে। আজিমপুর গোরস্থানে কবর দেয়া হয়েছে তাদের। কেন এমন হলো? কেন তারা মারা গেল? সারা বুক যন্ত্রণায় ফেটে পড়তে চাইলো তার। বোবা দৃষ্টি মেলে অসহায়ভাবে সে তাকালো লিলির দিকে।

লিলি ঝুঁকে পড়ে আবার জিজ্ঞেস করলো, কেমন লাগছে এখন আপনার? চারদিন ধরে অচৈতন্য হয়ে আছেন। মনসুর সাহেবসহ কত জায়গায় খুঁজেছি আপনাকে, শেষে প্রেসে গিয়ে দেখলাম জ্বরে বেহুশ হয়ে আছেন। এখন কেমন লাগছে আপনার?

একে-একে বিশ্রামাগারে যাওয়া আর প্রেসে এসে বেঞ্চের ওপর শুয়ে পড়ার ছবিটা ভেসে উঠলো চোখে। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে মৃতদেহগুলো আবার দেখা দিলো চোখে। বুকটা শূন্যতায় হু হু করে উঠলো। হঠাৎ বালিশে মুখ গুঁজে

ডুকরে কেঁদে উঠলো মাহমুদ। এই প্রথম চোখ ফেটে কান্না এলো তার। বেদনা জড়িত গলায় সে বললো, কেন এমন হলো বলতে পারেন, কেন এমন হলো? আমার যে কেউ রইলো না আর, কেউ না, আমি কেমন করে বাঁচবো।

ধীরে ধীরে মুখখানা ওর মাথার ওপর নাবিয়ে আনলো লিলি। দু-চোখে অশ্রু বরছে তার। কান্নাভরা গলায় সে কানে কানে বললো, আমি আছি, আমি যে তোমার, ওগো বিশ্বাস করো। আমি আছি, ওগো একবার মুখখানা তুলে তাকাও আমার দিকে, একবার চেয়ে দেখো।

## উপসংহার

সকালের ডাকে আসা চিঠিখানা বারকয়েক নেড়েচেড়ে দেখলো লিলি।  
আঁকাবাঁকা অক্ষরে মাহমুদের নাম আর ঠিকানা লেখা। অপরিচিত হস্তাক্ষর।

দুপুরে সে বাসায় এলে লিলি বললো, তোমার চিঠি এসেছে একখানা।  
টেবিলের ওপর রাখা আছে।

খামটা ছিড়ে চিঠিখানা পড়লো মাহমুদ।  
শাহাদাত লিখেছে ভৈরব থেকে।

মাহমুদ,

অনেক দিন তোমার কোন খোঁজ-খবর পাই নি। জানি না কেমন আছো।  
আজ বড় বিপদে পড়ে চিঠি লিখছি তোমাকে। জানি এ বিপদ থেকে তুমি কেন  
কেউ উদ্ধার করতে পারবে না আমায়। তবু মানসিক অশান্তির চরম মুহূর্তে  
নিজের দুঃখের কথা ব্যক্ত করার মতো তুমি ছাড়া আর কাউকে পেলাম না। তাই  
লিখছি।

আমেনার যক্ষ্মা হয়েছে।

ঢাকা থাকতেই রোগের প্রাথমিক লক্ষণগুলো দেখা দিয়েছিলো। এখন  
বোধ হয় তার শেষ দিন ঘনিয়ে এলো।

তুমি হয়তো অবাক হয়ে ভাবছো, এতদিন পরে এ খবরটা তোমাকে  
জানাতে গেলাম কেন। আসলে আমিও এ ব্যাপারে প্রায় অজ্ঞ ছিলাম। আমাকে  
সে কিছুতেই জানতে দেয় নি। মাঝে মাঝে লক্ষ করতাম, একটানা অনেকক্ষণ  
ধরে খকখক করে কাশতো সে। বড় বেশি কাশতো। কখনো কখনো তার কাপড়ে  
রক্তের ছিটেফোটা দাগ দেখে প্রশ্ন করেছি। কিন্তু কোন উত্তর পাই নি। আবার,  
একদিন রাতে অকস্মাৎ রক্তবমি করতে করতে মুছা গেল সে। ডাক্তার ডাকলাম।

রোগী দেখে তিনি ভীষণ গালাগাল দিলেন আমায়। বললো, তক্ষুনি ঢাকায় নিয়ে যেতে।

কিন্তু, আমেনা কিছুতে রাজী হলো না।

তার স্বভাব তোমার অজানা নয়।

একদিন ভাইদের অমতে সে বিয়ে করেছিলো আমায়। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলো মাথা উঁচিয়ে। সেসব কথা তুমি জানো। ভাইদের কাছ থেকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিলো তাকে। আজ তাদের সামনে তিল তিল করে মরতে সে রাজী নয়। টাকা-পয়সার জন্যে হাত পাতবে এ কথা কল্পনাও করতে পারে না সে।

এদিকে আয় বড় কমে গেছে। দোকানের অবস্থা খুব ভালো নয়। লোকের হাতে টাকা নেই, চাহিদা

থাকলেও জিনিসপত্র কিনবে কি দিয়ে?

জীবনে কিছুই করতে পারলাম না মাহমুদ।

আমেনার জন্যও যে এ মুহূর্তে কিছু করতে পারবো, ভরসা হয় না। সারাটা জীবন ও শুধু আমাকে দিয়ে গেলো। ওকে আমি কিছু দিতে পারলাম না। দোয়া করো, ওর সঙ্গে আমিও যেন কবরে যেতে পারি।

এ দুনিয়াতে এর চেয়ে বড় কোন চাওয়া কিংবা পাওয়া আর নেই আমার। ছেলে-মেয়েগুলোর জন্য মাঝে মাঝে ভাবনা হয়। খোদা দিয়েছেন, খোদাই চালিয়ে নেবেন ওদের। এতক্ষণ শুধু নিজের কথা লিখলাম, কিছু মনো করো না।

তোমাদের দিনকাল কেমন চলছে জানিও। লিলি কেমন আছে? মিতাকে আমার চুম্বন দিয়ো।

তোমার শাহাদাত।

চিঠিখানা একবার পড়ে শেষ করে আবার পড়লো মাহমুদ। তারপর চোয়ালে হাত রেখে অনেকক্ষণ বসে বসে কিছু ভাবলো সে। মিতাকে কোলে নিয়ে লিলি এসে দাঁড়ালো পাশে। মৃদু গলায় শুধালো কার চিঠি ওটা?

মাহমুদ বললো, শাহাদাত লিখেছে।

লিলি জানতে চাইলো, ওরা ভালোতো?

মাহমুদ চিঠিখানা এগিয়ে দিলো ওর দিকে।

লিলির পড়া শেষ হলে মাহমুদ আস্তে করে বললো, আমাকে এক্ষণি আবার বেরুতে হচ্ছে লিলি।

এই বেলায় কোথায় যাবে? লিলি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো।

মাহমুদ ধীর গলায় বললো, আমেনাকে এখানে নিয়ে আসার জন্যে একখানা টেলিগ্রাম করবো ভাবছি।

লিলির মুখখানা অকস্মাৎ স্নান হয়ে গেলো। ইতস্তত করে সে বললো, এখানে আনবে?

মাহমুদ লক্ষ করলো লিলি ভয় পেয়েছে। একটা যক্ষ্মা রোগীকে বাসায় আনা হবে, বিশেষ করে যে ঘরে একটি বাচ্চা মেয়ে রয়েছে সেখানে, ভাবতে আতঙ্ক বোধ করছে লিলি।

ওর খুব কাছে এগিয়ে এসে শান্ত গলায় বললো, আমার যদি কোন কঠিন অসুখ হয় তাহলে কি আমাকে তুমি দূরে সরিয়ে দিতে পারবে লিলি? তবে ওর জন্যে তুমি ভয় করছো কেন?

লিলি গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলো, ওটা যা ছোঁয়াচে রোগ-না, ওকে এখানে আনতে পারবে না তুমি। মিতাকে বুকের মধ্যে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরলে সে।

দেখো তোমাদের এ স্বভাবটা আমার একেবারে পছন্দ হয় না, সহসা রেগে উঠলো মাহমুদ সব সময় নিজেকে নিয়ে চিন্তা করো তোমরা। লিলির

চোখে-মুখে কোন ভাবান্তর হলো না। মিতাকে কোলে নিয়ে জানালার পাশে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো সে।

মাহমুদ নীরব।

পায়ের শব্দে লিলি ফিরে তাকিয়ে দেখলো বাইরে বেরিয়ে গেল মাহমুদ। রাস্তায় নেমে, কাছের পোস্টাফিস থেকে শাহাদাতকে একখানা টেলিগ্রাম করে দিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে আবার ফিরে এলো মাহমুদ। এসে বিছানায় চুপচাপ শুয়ে পড়লো সে।

লিলি এখনও জানালার পাশে দাঁড়িয়ে হাতের নখ খুঁটছে। মিতাকে সে একটু আগে শুইয়ে দিয়েছে তার দোলনায়।

ঈষৎ তন্দ্রায় চোখজোড়া জড়িয়ে আসছিলো মাহমুদের। লিলির ডাকে চোখ মেলে তাকালো সে।

লিলি কোমল কণ্ঠে ডাকলো, শুনছো?

মাহমুদ আস্তে শুখালো, কী?

আমি বলছিলাম কি, টেলিগ্রাম করে কি হবে, ওর কাছে এসে বসলো লিলি-তারচে, তুমি নিজে গিয়ে দেখে এসো ওকে।

লিলির কণ্ঠস্বরটা এখন সহানুভূতির সুরে ভরা।

মাহমুদ দুহাতে ওকে কাছে টেনে নিয়ে মৃদু স্বরে বললো, আমি জানতাম লিলি, তুমি ওকে দূরে সরিয়ে দিতে পারবে না।

লিলি সলজ্জ হেসে ঘুমন্ত তার দিকে তাকালো এক পলক, কিছু বললো না। কাল মিতার জন্মদিন। রাতে শুয়ে শুয়ে সে ব্যাপারে আলোচনা করেছে ওরা। মাহমুদ বলেছে বেশি লোককে ডাকা চলবে না, ওতে অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হয়।

ওর বাহুর উপর মাথা রেখে লিলি শুধিয়েছে, তুমি কাকে বলতে চাও?

মাহমুদ মৃদু স্বরে বলেছে, রফিককে বলবো, আর বলবো নঈমকে।

আমি মনসুরকে বলে দিয়েছে, বউকে সঙ্গে নিয়ে সে আসবে। লিলি আস্তে করে বলেছে, তসলিমকেও খবর দিয়েছি।

মাহমুদ সংক্ষেপে বলেছে, ঠিক আছে।

তারপর ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়েছে ওরা।

ভোরে উঠে হাতমুখ ধুয়ে চা-নাস্তার পরে মাহমুদ যখন বেরুতে যাবে তখন লিলি স্মরণ করিয়ে দিলো, যাদের বলার আছে এই বেলা বলে এসো। আর শোন, ভৈরব কবে যাচ্ছো তুমি?

যাওয়ার পথে থামলো মাহমুদ। থেমে বললো, দেখি, কাল কিংবা পরশু যাবো। আমেনা যখন মেয়ে নিশ্চয় আসতে চাইবে না, টেলিগ্রামটা পেয়েছে কিনা কে জানে। কাটা কাটা কথাগুলো বলে রাস্তায় নেমে এলো সে।

জিন্নাহ অভিনুতে নতুন অফিস করেছে রফিক।

এখন আর অন্যের অধীনে কাজ করছে না, সে নিজস্ব কোম্পানি খুলেছে একটা। স্বাধীন ব্যবসা। বড় বড় কনট্রাক্ট পাচ্ছে আজকাল। রাস্তা মেরামত, বাড়ি ঘর তৈরি কিংবা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ইট, চুন, সুরকি ও লোহালব্ধর সরবরাহের কনট্রাক্ট। প্রেস হয়ে যখন রফিকের অফিসে এসে পৌঁছলো মাহমুদ, তখন বেশ বেলা হয়েছে। বাইরের ঘরে কয়েকজন কর্মচারী নীরবে কাজ করছে। তাদের একপাশে নষ্টমকে দেখতে পেলো মাহমুদ। মস্ত বড় একটা খাতার উপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন হিসেব করছে। ওর দিকে চোখ পড়তে ইশারায় কাছে ডাকলো, মাহমুদ যে, কি মনে করে?

মাহমুদ বললো, কাল মিতার জন্মদিন, তাই তোমাদের নেমন্তন্ন করতে এলাম। রফিক আছে কি?

আছে। পর্দা ঝুলানো চেয়ারটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে নষ্টম বললো, একটু আগে এসেছে। যাওনা, দেখা করো গিয়ে। এই শোনো-।



হঠাৎ কি মনে হতে ওকে আবার কাছে ডাকলো নঈম-তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, ভীষণ সিরিয়াস কথা, বসো বলছি।

মাহমুদ বসলো।

সামনে খোলা খাতাটা বন্ধ করে এক পাশে ঠেলে রেখে দিলো নঈম।

চার পাশে তাকিয়ে নিয়ে চাপা গলায় ধীরে ধীরে বললো, রফিক একটা মেয়েকে ভালবাসতো মনে আছে তোমার?

হ্যাঁ, মাহমুদ মাথা দুলিয়ে সায় দিলো?

সে মেয়েটা এখনো তাকে ভালোবাসে।

হুঁ।

আজ কদিন ধরে রফিক কি বলছে জানো?

না।

বলছে-বলতে গিয়ে বার কয়েক নড়েচড়ে বসলো নঈম-রফিক বলছে মেয়েটাকে নাকি আমাকে বিয়ে করতে হবে।

সেকি? মাহমুদ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো ওর দিকে। তুমি করতে যাবে কেন?

দেখতো মজা। ঠোঁটের ফাঁকে মিটিমিটি হাসলো নঈম। এককালে ভালবাসতো রফিক একথা ঠিক, এখন সেসব কোথায় উবে গেছে। কিন্তু মেয়েটা ভীষণ হ্যাংলা, কিছুতে ওর পিছু ছাড়বে না। এখন হয়েছে কি-বলতে গিয়ে আরো সামনে ঝুঁকে এলো সে, চাপা গলায় বললো, মেয়েটা প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে। এবোরসন করার জন্য চাপ দিয়েছিলো রফিক। কিন্তু মেয়েটা কিছুতে রাজী হচ্ছে না। মাঝখান থেকে বড় বিপদে পড়ে গেছে রফিক। তাই আজ কদিন ধরে সে আমায় ধরে বসেছে। বলছে আমার বেতন আরো বাড়িয়ে দেবে আর বিয়ের খরচ-পত্র সব নিজে বহন করবে। নঈম হাসলো।

মাহমুদ নীরব। সারা দেহ পাথর হয়ে গেছে।

ওকে চুপ থাকতে দেখে নঈম আবার বললো, বন্ধু হিসেবে ওর এ দুঃসময়ে ওকে বাঁচানো উচিত সেকথা আমি বুঝি কিন্তু- কিছু বলতে গিয়ে ইতস্তত করছিলো নঈম। সহসা উঠে দাঁড়ালো মাহমুদ।

ওকি চললে কোথায়? বসো। নঈম অবাক চোখে তাকালো ওর দিকে। মাহমুদ মৃদু গলায় বললো, কাজ আছে, চলি এখন।

রফিকের সঙ্গে দেখা করবে না?

না।

দ্রুতপায়ে বেরিয়ে আসছিলো মাহমুদ। পেছনে রফিকের উচ্ছ্বাস ভরা কণ্ঠস্বর শুনে থমকে দাঁড়ালো সে। আরে মাহমুদ যে, ওকি, এসে চুপি চুপি আবার চলে যাচ্ছে? মাহমুদকে পেয়ে অধীনস্থ কর্মচারীদের উপস্থিতি যেন ভুলে গেছে সে। এগিয়ে এসে ওর একখানা হাত চেপে ধরে বললো, এসো তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার, চেষ্টা করে এসো।

মাহমুদ বললো, না, আমার কাজ আছে, যাই এখন।

কাজ কাজ আর কাজ। কাজ কি শুধু তোমার একলার। আমি বেকার নই। আমারও কাজ আছে। এসো, একটু বসে যাবে। মাহমুদকে সঙ্গে নিয়ে চেষ্টা করে ফিরে আসার পথে আড়চোখে একবার নঈমের দিকে তাকালো রফিক। লম্বা খাতাটার ওপর ঝুঁকে পড়ে গভীর মনোযোগসহকারে হিসেব মিলাচ্ছে সে।

সোনালি রঙের কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে দুঠোঁটের ফাকে গুঁজে দিলো রফিক, আরেকটা সিগারেট মাহমুদকে দিলো, তারপর বললো, তোমরা আসো না। এলে কত ভাল লাগে সে আর কি বলবো। এইতো সারাদিন ব্যস্ত থাকি। যখন একটু অবকাশ পাই তখন তোমাদের কাছে পাই নে! কেমন আছে বলো। বউ আর মেয়ে ভালো আছে তো? কলিং বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকলো, দুকাপ চা আনার ফরমায়েশ দিলো। তারপর আবার বলতে লাগলো খোদাবক্সের দোকানে আজকাল যাও না? আমিও যাই না অনেকদিন হলো।

সেদিন পাশ দিয়ে আসছিলাম। দেখলাম বেশ চলছে ওর রেস্টোরাঁ। আজকাল রেকর্ডে সারাদিন ধরে হিন্দি গান বাজায় সে। দেয়ালে অনেকগুলো ফিল্মস্টারের ছবি বুলিয়ে রেখেছে, তাই না? একটানা কথা বলে গেলেও মাহমুদ লক্ষ্য করলো অবচেতন মনে কি যেন ভাবছে রফিক।

চা খেয়ে নিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরালো সে। চেয়ারে হেলান দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, নঈমের আমি একটা বিয়ে দিতে চাই, দিন দিন ও বড় খেয়ালি হয়ে যাচ্ছে, ওর সংসারী হওয়া উচিত। আড়চোখে একবার মাহমুদের দিকে তাকালো সে।

মাহমুদ বললো, তুমি নিজে কি চিরকুমার থাকবে নাকি?

না, না, মোটেই না। সামনে এগিয়ে টেবিলের ওপর দুহাতের কনুই রেখে পরক্ষণে জবাব দিলো, তবে হ্যাঁ, আপাতত ও ধরনের কোন প্ল্যান নেই আমার। সময় কোথায় বল, সময় থাকলে তবু চিন্তা করা যেতো।

মাহমুদ মৃদু হাসলো।

রফিক ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সহসা বললো, নঈমকে তুমি একটু বোঝাতে পারো? তোমার কথা সে নিশ্চয় শুনবে। ওর জন্যে ভালো একটি মেয়ে ঠিক করেছি আমি। কিন্তু, ও রাজী হচ্ছে না। বললাম, সব খরচ আমার তবু—

আরো কিছু যেন বলতে যাচ্ছিলো সে, মাহমুদ মাঝখানে বাধা দিয়ে বললো, ওর জন্যে অত মাথা ঘামিয়ে মূল্যবান নষ্ট করা কি উচিত? বলে উঠে দাঁড়ালো মাহমুদ। চলি আজ।

আরে শোন, দাঁড়াও। রফিক পেছনে থেকে ডাকলো। কি জন্যে এসেছিলে কিছু বললে না তো?

এমনি। বলে দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে এলো সে। পাখার নিচে বসেও এতক্ষণে রীতিমত ঘেমে উঠেছে মাহমুদ।

মিতার জন্মদিনে বড় রকমের কোন আয়োজন করে নি ওরা। কিছু প্যাস্ট্রি, ডালমুট আর কলা। এক কাপ করে চা সকলের জন্যে। বিকেলে আমন্ত্রিত অতিথিরা একে একে এলো।

মনসুর আর সেলিনা। তসলিম আর নঈম। ছোট ঘরে বেশি লোককে বসাবার জায়গা নেই। তাই অনেককে বলতে পারেনি ওরা। তবু ছোটখাট আয়োজনটা বেশ জমে উঠলো অনেকক্ষণ।

মিতাকে আগের থেকে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছিলো লিলি। কোলে নিয়ে সবাই আদর করলো তাকে।

সেলিনা বললো, দেখতে ঠিক মায়ের মত হয়েছে।

মনসুর বললো, রঙটা পেয়েছে বাবার।

লিলি বললো মেয়ে হয়ে বিপদ হলো, ছেলে হলে তোমাদের জামাই বানাতাম।

সেলিনা বললো, আমার কিন্তু ছেলে হবে, দেখো লিলি আপা।

মনসুর বললো, আমি কিন্তু মেয়ে চাই।

সেলিনা ঠোঁট বাকিয়ে বললো, তুমি চাইলেই হলো নাকি?

হয়েছে মান-অভিমানের পালাটা তোমরা বাসায় গিয়ে করো-লিলি হেসে বললো।

এখন সবাই মিলে মিতার স্বাস্থ্য পান করবে এসো।

মেয়েকে মাহমুদের কোলে বাড়িয়ে দিয়ে, খাবারগুলো এনে টেবিলে সাজিয়ে রাখলো লিলি।

সবার অনুরোধে নঈম একটা গান শোনালো ওদের।

তারপর খাওয়ার পালা।

প্যাস্ট্রি। ডালমুট। কলা। সবশেষে চা।

তসলিমের দিকে চায়ের কাপটা বাড়িয়ে দিয়ে লিলি মৃদু হেসে বললো, তুমি একা এলে, রানুকে আনলে না যে?

তসলিম লজ্জা পেয়ে বললো, আসার কথা ছিলো। কিন্তু বাসা থেকে বেরুতে পারিনি ও।

লিলি মুখ টিপে আবার হাসলো ওর বাবা-মা বুঝি ওকে কড়া নজরে রেখেছে আজকাল?

তসলিম দ্রুত ঘাড় নাড়িয়ে বললো, হ্যাঁ।

মনসুর চায়ের কাপে চুকুম দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, বিয়ের দিন তারিখ কি এখনো ঠিক হয় নি?

না, এখনো কথাবার্তা চলছে। মৃদু জবাব দিলো তসলিম। লিলি আবার ঠোঁট টিপে হাসলো, বেচারি বড় অস্থির হয়ে পড়েছে। তসলিম লজ্জায় লাল হযুএ গিয়ে বললো, হুঁ তোমাকে বলেছে আর কী। শুধু শুধু বাজে কথা বলো।

চা-নাস্তা শেষ হলে আরো অনেকক্ষণ গল্প করলো ওরা। সিমেলা নিয়ে আলোচনা করলো। পত্র-পত্রিকা আর রাজনীতি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হলো। তারপর একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেলো সবাই।

মিতাকে কোলে নিয়ে আদর করছিলো মাহমুদ। লিলি বললো তোমার কি হয়েছে বলতো, সবাই বললো, তুমি একটা কথাও বললে না?

মাহমুদ হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললো, তুমি তো জানো লিলি, অতিরিক্ত হুজুড় ভালো লাগে না আমার।

তাই বলে বুঝি একটা কথাও বলতে হবে না? কপট অভিমান করে লিলি বললো, ওরা কি মনে করলো বল তো?

কেন, তুমিতো কথা বলেছে সবার সাথে। মাহমুদ জবাব দিলো মৃদু গলায়। মিতা ঘুমিয়ে পড়েছে কোলে।

লিলি বিছানায় নিয়ে শোয়াল তাকে। কপালে একটু চুমু খেয়ে আদর করলো। গায়ের কাপড়টা মিতার আঙুলে করে টেনে দিলো সে।

টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখা হয়েছে সার সার বই। মাহমুদ বইগুলো উলটে খোঁজ করছিলো খাতাটা।

লিলি কাছে এসে বললো, কি খুঁজছো?

মাহমুদ বললো, আমার সেই খাতাটা সেই লাল কভার দেয়া।

লিলি বললো, তুমি বসো, আমি খুঁজে দিচ্ছি।

মিতার পাশে এসে বসলো মাহমুদ। লিলি বইগুলো উল্টে পাল্টে খোঁজ করছিলো খাতাটা। হঠাৎ একটা বই থেকে কি যেন পড়ে গেলো মাটিতে। উপুড় হয়ে ওটা হাতে তুলে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো লিলি।

মাহমুদ বললো, কি ওটা? বলতে বলতে লিলির পেছনে এসে দাঁড়ালো সে।

লিলির হাতে একখানা ফটো। গ্রুপ ফটো। হাসমত আলী, মাহমুদ, সালেহা বিবি, মরিয়ম, হাসিনা সকলে আছে। তসলিম তুলেছিলো ওটা, আজও মনে আছে মাহমুদের।

ফটোর দিকে চেয়ে মৃদু গলায় লিলি জিজ্ঞেস করলো, ক-বছর হলো?

মাহমুদ ওর কাঁধের ওপর হাত জোড়া রেখে বললো, পাঁচ বছর।

পাঁচটা বছর চলে গেছে, তাই না? লিলির দৃষ্টি তখনো হাতে ধরে রাখা ফটোটর উপর। ধীরে ধীরে মাহমুদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর মুখে চোখ তুলে তাকালো লিলি। চোখজোড়া পানিতে টলমল করছে ওর।

দুজনে মৌন।

দুজনে নীরব।

মাহমুদের গলা জড়িয়ে ধরে ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো লিলি। বুকটা অস্বাভাবিক কাঁপছে ওর। অসহায়ের মত কাঁপছে।

ওর ঘনকালো চুলগুলোর ভেতর সন্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে মাহমুদ মৃদু গলায় বললো, কেন কাঁদছো লিলি। জীবনটা কি কারো অপেক্ষায় বসে থাকে? আমাদেরও একদিন মরতে হবে। তখনো পৃথিবী এমনি চলবে। তার চলা বন্ধ হবে না কোনদিন। যে-শক্তি জীবনকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে তার কি কোন শেষ আছে লিলি?